হাতে কলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১.১ তোমার চেনা এমন দুটি গাছের নাম লেখো অন্ধকারে যাদের দেখলে মনে হয় যেন মানুষের মতো হাত নেড়ে ডাকছে।

১.২ দুই বন্ধু আর ভাল্লুককে নিয়ে যে গল্পটি আছে তা তোমরা শুনেছ? যদি না শুনে থাকো, তাহলে শিক্ষকের থেকে জেনে নিয়ে গল্পটি নিজের খাতায় লেখো।

১.৩ নানারকম রঙিন মাছ তুমি কোথায় দেখেছ?

১.৪ ভোরের আলো তোমার কেমন লাগে? তখন তোমার কোথায় যেতে ইচ্ছে করে?

১.৫ আলোয় এবং অন্ধকারে একই গাছের দুরকম চেহারা তোমার চোখে কীভাবে ধরা পড়ে?

শব্দার্থ : পশলা — একবারের বৃষ্টি। কম্প — কাঁপুনি। ঝিকিরমিকির—ঝিকিমিকি। ঝিলিক — তীব্র কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী আলোর ছটা, চমক। আবছায়া— আবছা/অস্পষ্ট ছায়ার মতো। ঝালর— যা ঝলমল করে ঝুলতে থাকে।

২. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক	খ
গাছ	অশরীরী
বন	বৃক্ষ
ভূত	কাঁপুনি
ঝালর	অরণ্য
কম্প	পর্দা

৩. কবিতা অবলম্বনে শূন্যস্থান পূরণ করো :

৩.১ এক যে ছিল ______________।

৩.২ বিষ্টি হলেই আসত ______________ কম্প দিয়ে ______________।

৩.৩ ______________ হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ ______________ মাছ।

৩.৪ ______________ পশলার ______________।

৩.৫ বনের মাথায় ঝিলিক মেরে ______________ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ______________ করত সে ______________।

৪. **কবিতাটি অবলম্বনে একটি গল্প তৈরি করো :**

একটি গাছ ছিল সন্ধে হলেই ________________ । আবার কখনো হঠাৎ বনের ______________________________ ________________ । যখন বৃষ্টি শেষ হয়ে যেত ________________ । ভোরবেলায় কত কী যে ________________ ________________ আর যখন সকাল হতো ________________________________ ।

৫. **শব্দগুলির অর্থ লিখে তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :** ঝাঁক, ঝিলিক, ঘাড়, মুকুট, ঝিকিরমিকির।

৬. **কোনটি কী জাতীয় শব্দ শব্দঝুড়ি থেকে বেছে নিয়ে আলাদা করে লেখো :**

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া

গাছ, যে, বা, রূপালি, জুড়ত, তুলে, হয়ে, ঝিকিরমিকির, লক্ষ, সে, কম্প, জ্বর।

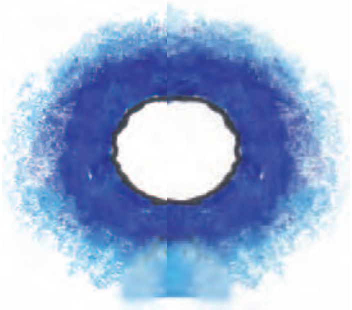

৭. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** সন্ধে, হঠাৎ, শেষে, হেসে, আলো।

৮. **সমার্থক শব্দ লেখো :** গাছ, ভূত, বন, বিষ্টি, মাছ, চাঁদ।

৯. **প্রতিটি বাক্য ভেঙে আলাদা দুটি বাক্যে লেখো :**

৮.১ এক যে ছিল গাছ, সন্ধে হলেই দুহাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।

৮২ বিষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।

৮.৩ সকাল হল যেই, একটিও মাছ নেই।

৮.৪ মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।

৮.৫ ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গর্‌গর্‌।

১০. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

র্‌ গ র্‌ গ, ট কু মু, ব আ য়া ছা, র কি মি ঝি র কি, র বে ভো লা।

অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০) : জন্ম বাংলাদেশের শ্রীহট্টে। কবি ও প্রাবন্ধিক। রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ ‘ভানুমতীর মাঠ’, ‘রুদ্রবসন্ত’, ‘ডিহংনদীর বাঁকে’, ‘জলডম্বুর পাহাড়’, ‘রক্তসন্ধ্যা’, ‘উড়ো চিঠির ঝাঁক’। নদী, পাহাড়, অরণ্যপ্রকৃতি তাঁর কবিতার কেন্দ্রভূমি।

‘মায়াতরু’ কবিতাটি তাঁর ‘ভানুমতীর মাঠ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১১.১ কবি অশোকবিজয় রাহার দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১১.২ তাঁর কবিতা রচনার প্রধান বিষয়টি কী ছিল?

১১.৩ ‘মায়াতরু’ কবিতাটি তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

১২. দিনের কোন সময়ে কোন ঘটনাটি ঘটছে পাশে পাশে লেখো। খাতায় ছবি আঁকো :

১২.১ দুহাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ ________

১২.২ ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত যে গর্‌গর্‌ ________

১২.৩ কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকিরমিকির আলোর রূপালি এক ঝালর ________

১৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৩.১ 'মায়াতরু' শব্দটির অর্থ কী? কবিতায় গাছকে 'মায়াতরু' বলা হয়েছে কেন?

১৩.২ শব্দের শুরুতে 'মায়া' যোগ করে পাঁচটি নতুন শব্দ তৈরি করো। একটি করে দেওয়া হল : **মায়াজাল**

________ ________ ________ ________ ________

১৩.৩ ভূতের আর গাছের প্রসঙ্গ রয়েছে এমন কোন গল্প তুমি পড়েছ? পাঁচটি বাক্যে সেই গল্পটি লেখো।

১৩.৪ দিনের বিভিন্ন সময়ে কবি গাছকে কোন কোন রূপে দেখেছেন?

১৪. যে গাছটিকে দেখে তোমার মনেও অনেক কল্পনা ভিড় জমায়, তার একটি ছবি আঁকো, সেই গাছটি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

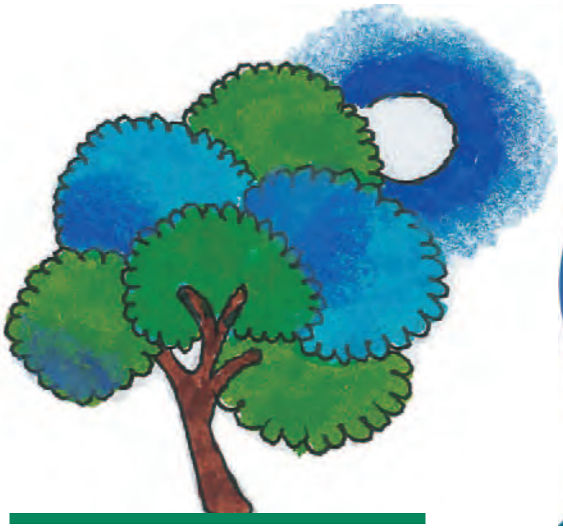

বৃষ্টি, আলো আর হাওয়ার খেলায় গাছ হয়ে ওঠে 'মায়াতরু'। ঠিক তেমনই অন্ধকার আর হাওয়া মাঠকে দেয় অন্য চেহারা। কেমন সে চেহারা, 'ময়দানব' কবিতাটি পড়ে নিজের ভাষায় লেখো।

ময়দানব

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যখন থাকে না কেউ
নির্জন মাঠে
হাওয়াসুর ঘুরে ঘুরে
শালপাতা চাটে।
রাস্তার বাতিগুলো
গা ঢাকে আঁধারে
ঠেলা দিয়ে ফেলে দেয়
আঁদাড়ে পাঁদাড়ে।
ময়দানবেরা সব
তাঁবু ছেড়ে এসে
দে গোল দে গোল বলে
ধরবেই ঠেসে।
তাছাড়া তো অ্যাং, ব্যাং
আর আছে চ্যাং,
হা-ডু-ডু বলেই তারা
খুলে নেবে ঠ্যাং।
জোনাকিরা উড়ে এসে
গায়ে দেবে ছ্যাঁকা —
যেয়ো না কো রাত্তিরে
ময়দানে একা।

ফণীমনসা ও বনের পরি

বীরু চট্টোপাধ্যায়

চ রি ত্র লি পি

সূত্রধার

ফণীমনসা

বনের পরি

ডাকাতদল

ঝড়

ছাগল

সূত্রধার : গভীর বন। তার ভেতরে ছোট্ট একটি ফণীমনসা গাছ। গাছটির মনে কিন্তু এক ফোঁটাও শান্তি নেই। আশেপাশে গাছেদের সুন্দর সুন্দর পাতা যতই সে দ্যাখে, রাগে দুঃখে মন তার রি-রি করে ওঠে। কী বিচ্ছিরি আর ছুঁচোলো পাতা তার—ভাবে সে। সবসময়েই কেঁদে কেঁদে আপশোশ করে—

ফণীমনসা : (সুরে) ছি ছি ছি এমন বরাত পাতা সব যেন রে করাত,
সরাৎ সরাৎ শব্দেতে জ্বালা ধরে।
উঁহুহু বর্শা-ফলক খোঁচা দেয়, রক্ত ঝলক
পলক পলক মনটা কেমন করে।।
হায় গো বনের পরি নিয়ত তোমায় স্মরি
করুণা করো বাচ্চা গাছের 'পরে।।

সূত্রধার : এমন সময় সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল বনের পরি। ওর কান্না শুনে থমকে দাঁড়াল সে। জিগ্যেস করল—

বনের পরি : কী হয়েছে গো আমার ছোট্ট ফণীমনসা গাছ? কাঁদছ কেন?

ফণীমনসা : তুমি এসেছ বনের পরি? তোমার পায়ে পড়ি আমার এই বিতিকিচ্ছিরি পাতাগুলি তুমি পালটে দাও।

বনের পরি : পাতা পালটাতে চাও? বেশ। কীরকম পাতা চাও তুমি বলো!

ফণীমনসা : আমায় তুমি খু—ব সুন্দর সোনার পাতা করে দাও।

বনের পরি : সোনার পাতা! বেশ! তথাস্তু!

সূত্রধার : বনের পরি এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কী আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে বাচ্চা ফণীমনসা গাছের কাঁটাভরা পাতা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে গজিয়ে উঠল অজস্র ঝলমলে সোনার পাতা। বাচ্চা গাছটি তো মহা খুশি। আনন্দে ডগমগ। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো কানে জবাফুল গোঁজা বাবরিওয়ালা একদল ডাকাত।

ডাকাতদল : (সুরে) হারে-রে হারে-রে হারে-রে হারে-রে

লুটেপুটে খাই বারেক ধরিব যারে-রে।

মোদের সঙ্গে শক্তিতে কে বা পারে-রে!

সূত্রধার : সহসা সেই জোয়ান ডাকাতদলের নজর পড়ল সোনার পাতা ভরা ছোট্ট ফণীমনসা গাছটির দিকে।

ডাকাতদল : (সুরে) আরে-রে আরে-রে, আরে-রে আরে-রে

গাছটা নুয়েছে সোনার পাতার ভারে-রে।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে বড়োলোক হয়ে যারে-রে

হারে-রে হারে-রে, হারে-রে হারে-রে।

সূত্রধার : বলতে দেরি আছে কিন্তু নিতে দেরি নেই। নিমেষ মধ্যে ডাকাতেরা সব সোনার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পোঁটলা বেঁধে ওকে একেবারে ন্যাড়া করে রেখে গেল। আর তক্ষুনি কান্নায় ভেঙে পড়ল ছোট্ট ফণীমনসা গাছ।

ফণীমনসা : (সুরে) আহা-হা উঁহু-হু ওহো-হো

আহা-হা ব্যথায় মরি হায় গো বনের পরি

আবারও তোমায় স্মরি,

করুণা করি বাঁচাও এসে মোরে।

বনের পরি : আবার কী হল গো তোমার ছোট্ট মেয়ে?

ফণীমনসা : (কান্নাভরা কন্ঠে) দ্যাখো দ্যাখো বনের পরি, চেয়ে দ্যাখো, ডাকাতেরা আমার কী হাল করে রেখে গেছে। সোনার পাতা আর চাই না।

বনের পরি : তা হলে তুমি কী চাও?

ফণীমনসা : এবার তুমি আমায় কাচের পাতা দাও।

বনের পরি : কাচের পাতা! বেশ! তথাস্তু!

সূত্রধার : বনপরি অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো কাচের পাতায় ঝলমলিয়ে উঠল ফণীমনসা গাছের সারা অঙ্গ। সেই কাচের পাতার ওপর সূর্যের কিরণ পড়ে রামধনু রং ঝিকিমিকি খেতে লাগল। মৃদুমন্দ বাতাসের দোলা লেগে সুমধুর টুং-টাং শব্দ হতে লাগল। কিন্তু এমন সময় আকাশ দিয়ে ধেয়ে এল দুর্দান্ত ঝড়।

(ঝড়ের শোঁ-শোঁ শব্দ)

ঝড় : (সুরে) হু-হু-হু শোঁ-শোঁ-শোঁ করে
চলি মোরা দর্প-ভরে,
পবনের দুষ্টু ছেলে মোরা গো—
পত পত পত ওড়াই পাতা,
মট মট মট ভাঙি মাথা,
ছোটো বড়ো গাছের আগাগোড়া গো!
শোঁ—শোঁ—হু—হু—মট—মট—ঝন—ঝন
ওলটপালট করি যে মোরা এই তো মোদের পণ—
ঝন ঝন—ঝন ঝন—ঝন ঝন—ঝন ঝন।

সূত্রধার : ভয়ানক ঝড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফণীমনসা গাছের কাচের সমস্ত পাতা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গেল। এক সময় ঝড় থামল আর শুরু হলো বাচ্চা গাছের অঝোরে কান্না।

ফণীমনসা : (সুরে) হায় হায় বনের পরি, তোমারে আবার স্মরি
এসো গো ত্বরা করি,
করুণা করি বাঁচাও এসে মোরে।

বনের পরি : আবার কাঁদছো কেন গো আমার ছোট্ট মেয়ে?

ফণীমনসা : চেয়ে দ্যাখো কী সর্বনাশ হয়েছে আমার। কাচ-ফাচ আর চাই না। তুমি আমায় এবার পালং শাকের মতো সুন্দর সবুজ কচি পাতা দাও।

সূত্রধার : পরি অদৃশ্য হতেই ছোট্ট ফণীমনসার গা ভরে দেখা দিল পালং-এর মতো কচি নরম সবুজ পাতা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আঃ কী শান্তি! ছোট্ট গাছটির এবার দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না। মৃদুমন্দ বাতাসে হেলতে দুলতে লাগল সে মজা করে। কিন্তু কী সর্বনাশ! একটা ছাগল এদিকে আসছে যে—

ছাগল : (সুরে) ব্যা—ব্যা—ব্যা—

যা কিছু পাই চিবিয়ে যে খাই,
ঘুরে বেড়াই ব্যা-ব্যা গান গেয়ে গো।
মোর কাছে সব লাগে মিষ্টি
ভগবানের বেবাক সৃষ্টি;
যা কাছে পাই চিবিয়ে গিলি—
জুতো থেকে পানের খিলি!
পেটখানারে চাক করি সব খেয়ে গো—

ফণীমনসা : ওমা কী ভয়ানক! দয়া করো—
বাঁচাও আমায়।

ছাগল : ব্যা ব্যা ব্যা
ব্যা ব্যা ব্যা পালংপাতা,
আগে তোর মুড়াই মাথা;
জিবে জল ঝরছে তোরে পেয়ে গো—

সূত্রধার : তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে ছাগলটা কচি কচি পালং পাতাগুলিকে কচকচ করে খেয়ে ফেলল। অবশেষে ছাগল চলে গেল।

ফণীমনসা : (কান্নায় ভেঙে পড়ে সুরে—)

কোথা গো বনের পরি
তোমারে আবার স্মরি,

ঘাট হয়েছে কানে ধরি,
করুণা করি বাঁচাও এসে মোরে।

বনের পরি : শোন গো আমার ছোট্ট মেয়ে! আমি কাছে থেকে সব স্বচক্ষে দেখেছি। নিজের অবস্থায় আর নিজের চেহারা নিয়ে যে সন্তুষ্ট না থাকে, তার তোমার মতোই দুর্দশা হয়, বুঝলে! শিক্ষা কিছু হয়েছে কি? এবার বলো কী চাও!

ফণীমনসা : (কান্নাভরা সুরে) আর কিছুই চাই না বনপরি! খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। আমায় আমার ওই কাঁটাভরা ছুঁচোলো পাতাই ফিরিয়ে দাও দয়া করে। সেই আমার শতগুণে ভালো। এই ন্যাড়া হাড়-জিরজিরে চেহারা আমি আর সইতে পারছি না।

বনের পরি : এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে তোমার। বেশ তাই হোক। তথাস্তু!

সূত্রধার : দেখতে দেখতে ফণীমনসার গায়ে তার নিজের রসভরা মোটা পাতা হয়ে গেল। আর কখনো সে মিছে বায়নাক্কা করেনি।

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১.১ ফণীমনসা তুমি দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

১.২ আর কোন কোন গাছ তুমি দেখেছ যাদের কাঁটা আছে?

১.৩ গাছের কাঁটা কীভাবে তাকে বাঁচায়?

১.৪ পরির গল্প তুমি কোথায় পড়েছ?

১.৫ সোনার মতো দামি আর কোন ধাতুর কথা তুমি জানো?

২. নীচের এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

ল ত কা ডা দ ___________ ন ণী ফ সা ম ___________

রি বি চ্ছি তি কি ___________ ক ং পা শা ল ___________

৩. এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে ঠিক বাক্যটি লেখো :

৩.১ বলো চাও কীরকম তুমি পাতা।

৩.২ হয়েছে তো সুবুদ্ধি তোমার এই।

৩.৩ না আর পাতা চাই সোনার।

শব্দার্থ : আপশোশ — আক্ষেপ। বিতিকিচ্ছিরি — কুৎসিত। তথাস্তু — তবে তাই হোক। রামধনু — মেঘ থেকে ঝরে পড়া জলের কণা সূর্যের আলোয় আকাশে ধনুকের মতো নানা রঙের যে প্রতিবিম্ব তৈরি করে। মৃদুমন্দ — আলতো ও মধুর। স্মরি — মনে করি। স্বচক্ষে — নিজের চোখে। বায়নাক্কা — আবদার।

৪. নীচের শব্দগুলোর একই অর্থ বোঝায় এমন শব্দ নাটকে ছড়িয়ে আছে। নাটক থেকে খুঁজে নিয়ে যে শব্দটি, নীচের যে শব্দটির সঙ্গে মানায়- লেখো :

বিশ্রী ___________ অনেক ___________ অবস্থা ___________

বল্লম ___________ ভাগ্য ___________ গর্ব ___________

হঠাৎ ___________ ভীষণ ___________ প্রতিজ্ঞা ___________

সমস্ত ___________ আবদার ___________ শরীর ___________

তবে তাই হোক ___________ কঙ্কালসার ___________

৫. নীচের বাক্যগুলির দাগ-দেওয়া প্রতিটি অংশই কোনো না কোনো আওয়াজ বোঝায়। এমন অনেক শব্দ নাটকে ছড়িয়ে আছে। খুঁজে বের করে লেখো (দুটি করে দেওয়া হলো) :

ছাগল কচকচ করে পাতা খেল।

পত পত পত ওড়াই পাতা।

----

৬. মুখে বললে, নীচের দাগ-দেওয়া শব্দগুলো কীভাবে বলবে, লেখো :

তোমায় স্মরি — করুণা করি বাঁচাও —

৭. দাগ-দেওয়া অংশে সমার্থক শব্দ বসিয়ে নীচের বাক্যগুলি আবার লেখো। শব্দঝুড়ির সাহায্য নিতে পারো।

৭.১ আহা-হা ব্যথায় মরি।

৭.২ শুরু হলো কচি গাছের অঝোর কান্না।

৭.৩ ডাকাতেরা আমার কী হাল করে রেখে গেছে।

৭.৪ আকাশ দিয়ে ধেয়ে এল দুর্দান্ত ঝড়।

অবিরাম, অবস্থা, গগন, যন্ত্রণা, চারাগাছ, প্রবল, আরম্ভ

৮. নীচের বাক্যগুলিতে দাগ-দেওয়া অংশগুলি আর কীভাবে লিখতে পারো? বাক্য যদি বদলে যায়, বদলেই লেখো। শব্দঝুড়ি থেকে সাহায্য নিতে পারো।

৮.১ মন তার রি রি করে ওঠে।

৮.২ ছোট্ট গাছটির এবার দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না।

৮.৩ জিবে জল ঝরছে তোরে পেয়ে গো

৮.৪ ঘাট হয়েছে কানে ধরি

গর্বে বুক ভরে ওঠে, লোভ জাগছে, মাফ করে দাও, হিংসায় জ্বলে ওঠে

৯. কাচ-ফাচ আর চাই না। —

এই বাক্যে পর পর দুটো শব্দ বসেছে, যেখানে দ্বিতীয় শব্দটির তেমন কোনো মানে নেই। আরো একটা শব্দ তোমার জন্য দেওয়া হলো, কাপড়-চোপড় । এরকম শব্দ তুমি আর কটা লিখতে পারো, লেখো।

১০. ছাগল খেয়ে ফেলেছিল কচি কচি পালং পাতা।

দাগ দেওয়া অংশে একটা শব্দ পরপর দু বার ব্যবহৃত হয়েই একটার জায়গায় আনেকগুলো পাতা বোঝাচ্ছে। এইরকম আর কটা শব্দ পরপর দুবার ব্যবহার করে একের জায়গায় অনেক বোঝাতে পারবে? নাটকে এমন কটি শব্দ খুঁজে পাও, তাও দেখো।

১১. নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দগুলি নাটকেই আছে। শব্দগুলি খুঁজে বার করো। সেই সকল শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করো :

দুর্বুদ্ধি—	দুঃখ—
অসন্তুষ্ট—	অল্প—
অসুন্দর—	বুড়ো—

১২. 'মৃদুমন্দ বাতাস' শব্দটির মানে ' হালকা হাওয়া' আর 'মন্দ' কথাটা সাধারণত আমরা ব্যবহার করি 'খারাপ'/ 'ভালো নয়' অর্থে। দু'টো অর্থেই দু'টো বাক্য লেখো :

মন্দ—

মন্দ—

১৩. নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য লেখো :

ওলটপালট—

দুর্দান্ত—

ঝিকিমিকি—

স্বচক্ষে—

দুর্দশা—

১৪. কোনটি কী ধরনের বাক্য লেখো :

১৪.১ আ! কি শান্তি!

১৪.২ পাতা পালটাতে চাও?

১৪.৩ সোনার পাতা আর চাই না।

১৪.৪ বেশ তাই হোক ! তথাস্তু!

১৪.৫ এবার তুমি আমায় কাচের পাতা দাও।

১৫. ছোটো ছোটো বাক্যে ভেঙে লেখো :

১৫.১ কাচের পাতার ওপর সূর্যের কিরণ পড়ে রামধনু রং ঝিকিমিকি খেতে লাগল।

১৫.২ পরি অদৃশ্য হতেই ফণীমনসার গা ভরে দেখা দিল কচি নরম পাতা।

১৫.৩ ডাকাতরা সব সোনার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পোঁটলা বেঁধে ওকে একেবারে ন্যাড়া করে রেখে গেল।

১৫.৪ ভয়ানক ঝড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফণীমনসা গাছের সমস্ত পাতা ছড়িয়ে পড়ে গেল।

১৬. পাশাপাশি ছোটো ছোটো বাক্যগুলি যোগ করে একটি বাক্য তৈরি করো :

১৬.১ একসময় ঝড় থামল। আর শুরু হল বাচ্চা গাছের অঝোর কান্না।

১৬.২ এমন সময়ে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল বনের পরি। ওর কান্না শুনে থমকে দাঁড়াল সে।

১৬.৩ গভীর বন। তার ভেতরে ছোট্ট একটি ফণীমনসা গাছ। গাছটির মনে কিন্তু এক ফোঁটাও শান্তি নেই।

১৬.৪ ছোট্ট গাছটির এবার দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না। মৃদুমন্দ বাতাসে হেলতে দুলতে লাগল সে মজা করে।

১৭. আরো বিশেষণ যোগ করতে পারো? একটা তোমার জন্যে করা রইল :

কচি	নরম	সবুজ পাতা
______	______	ছোট্ট গাছ
______	______	ন্যাড়া চেহারা
______	______	জোয়ান ডাকাত
______	______	ছোট্ট মেয়ে

১৮. পাশে যে ভাবে বলা আছে, সেই অনুযায়ী নীচের বাক্যগুলি বদলে আবার লেখো :

১৮.১ আকাশ দিয়ে ধেয়ে এল দুর্দান্ত ঝড়। (ঝড় আগামীকাল এলে কী লিখবে?)

১৮.২ বলতে দেরি আছে কিন্তু নিতে দেরি নেই। (কথাগুলো গতকাল হয়েছে বলতে হলে যেভাবে লিখবে)

১৮.৩ সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিল বনের পরি। (কথাগুলো এখনই বলা হচ্ছে, এমন হলে কী লিখবে?)

১৯. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১৯.১ ছোট্ট ফণীমনসা গাছের মনে শান্তি ছিল না কেন?

১৯.২ ফণীমনসা গাছের আশেপাশের গাছগুলোর পাতা কেমন ছিল?

১৯.৩ ফণীমনসা বারে বারে পাতাগুলো পালটে দেওয়ার আবেদন কার কাছে করছিল?

১৯.৪ প্রথমবারের আবেদনে ফণীমনসার গাছ জুড়ে কেমন পাতা হয়েছিল?

১৯.৫ সে সব পাতা ফণীমনসা হারালো কী করে?

১৯.৬ ডাকাতদলকে দেখতে কেমন?

১৯.৭ ঝড় এলে ফণীমনসা গাছের কাচের পাতার কী অবস্থা হলো?

১৯.৮ ছোট্ট ফণীমনসা গাছের দেমাকে মাটিতে পা পড়ছিল না কেন।

১৯.৯ সেই দেমাক তার ভেঙে গেল কীভাবে?

১৯.১০ শেষপর্যন্ত ফণীমনসা কেমন পাতা চাইল নিজের জন্য?

২০. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

২০.১ ‘বাচ্চা গাছটি তো মহা খুশি। আনন্দে ডগমগ’।— এত আনন্দ কখন হলো বাচ্চা গাছের ?

২০.২ ফণীমনসা গাছ কাচের পাতায় ভরে ওঠবার পরে তার চেহারাটি কেমন হয়েছিল?

২০.৩ মৃদু বাতাসে মনের আনন্দে দুলছে ফণীমনসা, এমন সময় ছাগল এসে উপস্থিত হওয়ায় কী ঘটল?

২০.৪ ছোট্ট গাছটি সত্যিই কি খুব শিক্ষা পেল বলে মনে হচ্ছে তোমার? কেমন সে শিক্ষা?

২১. বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে নাটকটির অভিনয় করো। (শ্রেণিকক্ষে শ্রুতি-অভিনয়ও করতে পারো)

বীরু চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৮৪) : শিশু ও কিশোর পাঠকদের উপযোগী রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনির লেখক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। তোমাদের পাঠ্য ‘ফণীমনসা ও বনের পরি’ নাটকটি ‘শিশুসাথী’ পত্রিকা (সংখ্যা ৪৩,বৈশাখ ১৩৭১) থেকে নেওয়া হয়েছে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনের আলো নিবে এল,
সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রং।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজল ঠঙ্‌ ঠঙ্‌।
ও পারেতে বিষ্টি এল,
ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা!
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
“বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান!”

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা।
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়,
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়।
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে—

কত দিনের লুকোচুরি
কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
“বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান!”

মনে পড়ে, ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে, মেঘের ডাকে
গুরু গুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের ’পরে দৌরাত্মি সে
না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি।
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে,
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান—
“বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।”

মনে পড়ে সুয়োরানি
দুয়োরানির কথা,

মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটি মিটি আলো,
চারি দিকে দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘলা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান!"

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা।
শিবঠাকুরের বিয়ে হল
কবেকার সে কথা।
সেদিনও কি এমনিতরো
মেঘের ঘটাখানা।
থেকে থেকে বিজুলি কি
দিতেছিল হানা।
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে
কী হল তার শেষে।
না জানি কোন নদীর ধারে,
না জানি কোন দেশে,
কোন ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান!"

হাতে কলমে

১. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

১.১ কোন কোন বাংলা মাসে সাধারণত বৃষ্টি হয়?

১.২ মেঘলা দিনে আকাশ ও তোমার চারপাশের প্রকৃতি কেমন রূপ ধারণ করে?

১.৩ বৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে—তোমার জীবনে মনে রাখার মতো এমন কোনো ঘটনার কথা লেখো।

১.৪ পুকুরে, টিনের চালে, গাছের পাতায়—বৃষ্টি পড়ার শব্দগুলো কেমন হয় লেখো।

২. **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :**

ক	খ
ঝাপসা	বন্যা
ছেলেবেলা	অস্পষ্ট
বিছানা	শৈশব
দুরন্ত	শয্যা
বান	দামাল

শব্দার্থ : ঝাপসা — অস্পষ্ট। মানিক — চুনি, মূল্যবান রত্ন। বাদলা — মেঘলা। পল— মুহূর্ত। দৌরাত্ম্য — দুরন্তপনা।

৩. **বেমানান শব্দের তলায় দাগ দাও :**

৩.১ সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি, আকাশ, বাড়ি

৩.২ ডোবে ডোবে, লোভে লোভে, পলে পলে, দেশে দেশে, টাপুর টুপুর

৩.৩ গাছপালা, মেঘ, হাওয়া, বাদল, মানিক

৩.৪ মা, খোকা, দৌরাত্ম্য, হাসিমুখ, শিবঠাকুর

৩.৫ মেঘের খেলা, লুকোচুরি, টাপুর টুপুর, নদী, সুয়োরানি

৪. **বিপরীতার্থক শব্দ কবিতা থেকে বেছে নিয়ে লেখো :** রাত, বার্ধক্য, খরা, পুরোনো, শান্ত

৫. **বিশেষ্য ও বিশেষণ খুঁজে নিয়ে লেখো :**

একশো মানিক, দুরন্ত ছেলে, বাদলা হাওয়া, গুরুগুরু বুক, ঝাপসা গাছপালা

৬. **ক্রিয়ার তলায় দাগ দাও :**

৬.১ কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ ঠঙ।

৬.২ কত খেলা পড়ে মনে।

৬.৩ শুনেছিলেম গান।

৬.৪ বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

৬.৫ বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে।

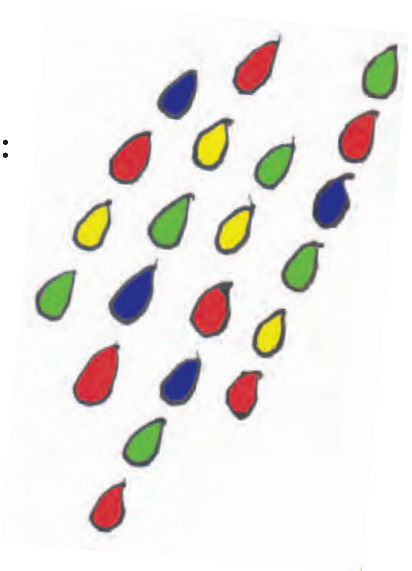

৭. ‘সৃষ্টি’—এমন ‘ষ্ট’ রয়েছে—এরকম পাঁচটি শব্দ লেখো :

৮. নীচের শব্দগুলোয় দুটো করে শব্দ লুকিয়ে আছে, আলাদা করে লেখো :

গাছপালা, ছেলেবেলা, হাসিমুখ, লেখাজোকা

৯. সাজিয়ে লেখো :

লে ছে বে লা, রি কো চু লু

১০. শূন্যস্থান পূরণ করো :

১০.১ আকাশ ঘিরে ________ জুটেছে।

১০.২ বাদলা ________ মনে পড়ে।

১০.৩ মনে পড়ে ________ আলো।

১০.৪ ঘরেতে ________ ছেলে।

১০.৫ বাইরে কেবল ________ শব্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ‘কথাকাহিনী’, ‘সহজপাঠ’, ‘রাজর্ষি’, ‘ছেলেবেলা’, ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘হাস্যকৌতুক’, ‘ডাকঘর’ শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে ‘Song Offerings’-এর জন্য এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর রচনা।

‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ কবিতাটি প্রথমে ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ শিরোনামে ১৩১০ বঙ্গাব্দে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবি স্বয়ং ছোটোদের জন্য ‘ছুটির পড়া’ শীর্ষক একটি সংকলন গ্রন্থে ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ নামে কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেন। এই সংকলন গ্রন্থটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থে গৃহীত কবিতাটির সঙ্গে ‘ছুটির পড়া’য় অন্তর্ভুক্ত কবিতাটির কিছু উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ রয়েছে। ‘ছুটির পড়া’ সংকলনটি প্রকাশ করার সময় কবি নিজেই কবিতাটির এই সমস্ত পরিমার্জন ঘটিয়েছিলেন। তাই, পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রকৃত ‘ছুটির পড়া’র পাঠটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

১১.২ কোন বইয়ের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান?

১১.৩ ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ কবিতাটি তাঁর কোন কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে?

১২. **মাঠে বা নদীতে বৃষ্টি পড়ছে এমন একটি ছবি আঁকো ও রং করো ।**

১৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

১৩.১ বৃষ্টির দিনে কবির মনে কোন গান ভেসে আসে?

১৩.২ বৃষ্টিতে নদীর এপার এবং ওপারের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

১৩.৩ 'সেদিনও কি এমনিতরো / মেঘের ঘটাখানা' — কোন দিনের কথা বলা হয়েছে? সেদিনের প্রকৃতির বর্ণনা দাও।

১৩.৪ মেঘের খেলা কবির মনে কোন কোন স্মৃতি বয়ে আনে?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' যেমন একটি বর্ষার কবিতা, তেমনই তিনি বর্ষা নিয়ে অনেক গানও লিখেছেন। সেইরকমই একটি গান তোমাদের জন্য রইল। গানটি কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ো এবং সুরে গাইতে চেষ্টা করো ।

বাদল-বাউল

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধ'রে ঝরোঝরো ঝরো ধারা ।।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হলো সারা।।
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ- মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা।।

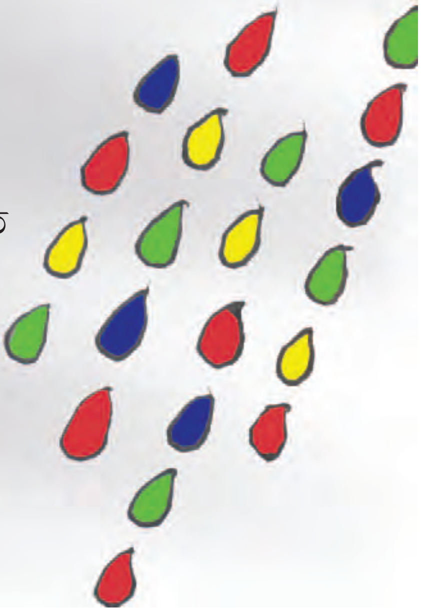

বোকা কুমিরের কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কুমির আর শিয়াল মিলে চাষ করতে গেল। কীসের চাষ করবে? আলুর চাষ। আলু হয় মাটির নীচে। তার গাছ থাকে মাটির উপরে, তা দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বোকা কুমির সে কথা জানত না। সে ভাবলে বুঝি আলু তার গাছের ফল।

তাই সে শিয়ালকে ঠকাবার জন্যে বললে, 'গাছের আগার দিক কিন্তু আমার, আর গোড়ার দিক তোমার।'

শুনে শিয়াল হেসে বললে, ‘আচ্ছা, তাই হবে!’

তারপর যখন আলু হলো, কুমির তখন সব গাছের আগা কেটে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে দেখে তাতে একটাও আলু নেই। তখন সে মাঠে গিয়ে দেখল, শিয়াল মাটি খুঁড়ে সব আলু তুলে নিয়ে গেছে। কুমির ভাবলে, ‘তাই তো। এবার বড্ড ঠকে গিয়েছি। আচ্ছা আসছে বার দেখব!’

তারপরের বার হলো ধানের চাষ। এবারে কুমির মনে ভেবেছে, আর কিছুতেই ঠকতে যাবে না। তাই সে আগে থাকতেই শিয়ালকে বললে, ‘ভাই, এবারে কিন্তু আমি আগার দিক নেব না, এবার আমাকে গোড়ার দিক দিতে হবে!’

শুনে শিয়াল হেসে বললে, ‘আচ্ছা, তাই হবে!’

তারপর যখন ধান হলো, শিয়াল সে ধানসুদ্ধ গাছের আগা কেটে নিয়ে গেল। কুমির তো এবারে ভারি খুশি হয়ে আছে। ভেবেছে, মাটি খুঁড়ে সব ধান বার করে নেবে।

হায় কপাল! মাটি খুঁড়ে দেখে সেখানে কিছু নেই। লাভের মধ্যে খড়গুলো গেল।

তখন কুমির তো বড্ড চটেছে, আর বলছে, ‘দাঁড়াও শিয়ালের বাছা, তোমাকে দেখাচ্ছি। এবারে আমি তোমাকে আগা নিতে দেবো না। সব আগা আমি নিয়ে আসব!’

সেবার হলো আখের চাষ।

কুমির তো আগেই বলেছে, এবার আর সে আগা না নিয়ে ছাড়বে না। কাজেই শিয়াল তাকে আগাগুলো দিয়ে নিজে আখগুলোকে নিয়ে ঘরে বসে মজা করে খেতে লাগল।

কুমির আখের আগা ঘরে এনে চিবিয়ে দেখল, খালি নোনতা, তাতে একটুও মিষ্টি নেই। তখন সে রাগ করে আগাগুলো সব ফেলে দিয়ে শিয়ালকে বলল, ‘না ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চাষ করতে যাব না, তুমি বড্ড ঠকাও!’

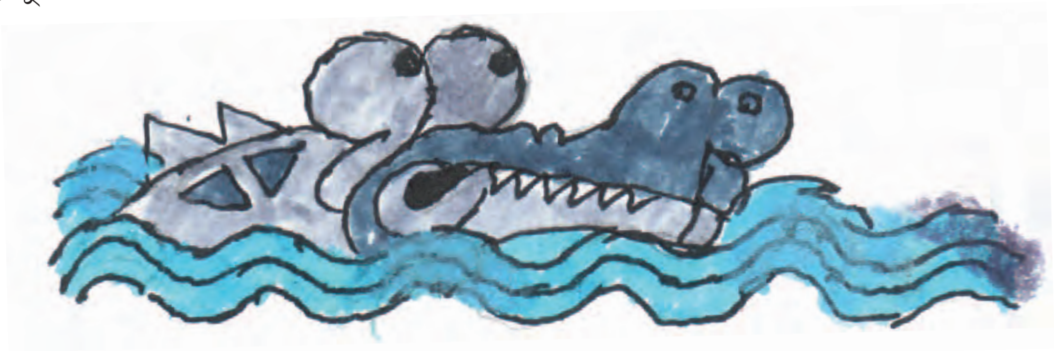

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১.১ তোমার জানা কয়েকটি উভচর প্রাণীর নাম লেখো।

১.২ তোমার জানা কয়েকটি সরীসৃপের নাম লেখো।

১.৩ ছোটোদের জন্য লেখা পশুপাখির গল্পে সবচেয়ে চালাক প্রাণী বলতে আমরা কাকে বুঝি?

১.৪ মাটির নীচে হয় এমন কয়েকটি ফসলের নাম লেখো।

১.৫ ধানগাছ থেকে আমরা কী কী পাই?

১.৬ কুমির ও শিয়ালকে নিয়ে লেখা অন্য কোনো গল্প পাঁচটি বাক্যে লেখো।

শব্দার্থ : আগা— ওপরের অংশ। গোড়া— শিকড়। খড়— বিচালি। নোনতা— লবণাক্ত। বড্ড— খুব।

২. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক	খ
কুমির	জঙ্গল
শিয়াল	নদী
আলু	ক্ষেত
আখ	খড়
গরু	চিনি

৩. গল্পের ঘটনাক্রম সাজিয়ে লেখো :

৩.১ কুমির শিয়ালকে ঠকাবার জন্যে বললে—গাছের আগার দিক কিন্তু আমার, আর গোড়ার দিক তোমার।

৩.২ কুমির আর শিয়াল মিলে চাষ করতে গেল ...আলুর চাষ।

৩.৩ সেবার হলো আখের চাষ। কুমির আগাগুলো নিয়ে চিবিয়ে দেখল ভীষণ নোনতা।

৩.৪ তারপরের বার হলো ধানের চাষ। কুমির গোড়াগুলো নিয়ে বুঝল সে খুব ঠকেছে।

৩.৫ কুমির শিয়ালকে বলল, না ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চাষ করতে যাব না, তুমি বড্ড ঠকাও।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করো :

৪.১ ____ আর ____ মিলে চাষ করতে গেল।

৪.২ সে ভাবলে বুঝি আলু তার গাছের ____।

৪.৩ শিয়াল সে ধানসুদ্ধ গাছের ____ কেটে নিয়ে গেল।

৪.৪ সেবার হল ____ চাষ।

৪.৫ শিয়াল মাটি ____ সব আলু তুলে নিয়ে গেছে।

৫. পাশের শব্দঝুড়ি থেকে খুঁজে নিয়ে একই অর্থের শব্দ পাশাপাশি লেখো :

চাষ, আখ, আগা, মাটি।

অগ্রভাগ, কৃষি, মৃত্তিকা, ইক্ষু

৬. বাক্য শেষ করো :

৬.১ 'বোকা কুমিরের কথা' গল্পটি পড়ে কুমিরটিকে আমার মনে হয়েছে, সে ________________।

৬.২ গল্পের শিয়ালটি আসলে খুব ________________।

৬.৩ কুমির গল্পে মোট ________ বার ঠকেছে। প্রথমবার সে ঠকে গেছে, কেননা ________________। দ্বিতীয়বার তার ঠকে যাওয়ার কারণ হল ________________। তারপরের বার ________________ না জানার জন্য সে ঠকে গেছে।

৬.৪ শিয়াল বারবার লাভবান হয়েছে, কারণ ________________।

৭. নীচে দাগ দেওয়া শব্দগুলি কোনটি কী জাতীয় শব্দ লেখো :

৭.১ কুমির আর শিয়াল মিলে <u>চাষ</u> করতে গেল।

৭.২ <u>সে</u> ভাবলে বুঝি আলু তার গাছের ফল।

৭.৩ আচ্ছা আসছে বার <u>দেখব</u>।

৭.৪ ভেবেছে, মাটি খুঁড়ে সব <u>ধান</u> বার করে <u>নেবে</u>।

৭.৫ এবার <u>আমাকে</u> <u>গোড়ার</u> দিক দিতে হবে।

৮. ঠিক বাক্যটির পাশে (✓) চিহ্ন দাও আর ভুল বাক্যটির পাশে (×) চিহ্ন দাও :

৮.১ গল্পের কুমিরটি অত্যন্ত চালাক-চতুর ছিল। ☐

৮.২ কুমিরটি চেয়েছিল শিয়ালকে সে ঠকাবে। ☐

৮.৩ আলুচাষে গোড়ার দিক পাওয়ায় শিয়াল ঠকে গেল। ☐

৮.৪ ধানচাষের বেলায় কুমির পেল আগার দিক। ☐

৮.৫ কুমির আখের গাছগুলো পেয়ে ঘরে বয়ে নিয়ে গিয়ে মজা করে খেতে লাগল। ☐

৯. **বাক্য রচনা করো :** আগা, গোড়া, চাষ, আখ, নোনতা।

১০. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** লাভ, মিষ্টি, নীচে, কাজ, মজা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩—১৯১৫) : জন্ম বাংলাদেশের ময়মনসিংহের মসুয়ায়। তিনি শিশু - কিশোরদের উপযোগী ভাষায় ছড়া, উপকথা, মনোরঞ্জক কাহিনি, বৈজ্ঞানিক কাহিনি রচনা করেন। তাঁর লেখা ‘ছেলেদের রামায়ণ’, ‘ছেলেদের মহাভারত’, ‘সেকালের কথা’, ‘টুনটুনির বই’, ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ বিখ্যাত। ১৯১৩ সালে তিনি ছোটোদের জন্য ‘সন্দেশ’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংগীত জগতে ও চিত্রবিদ্যাতেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, সুবিনয় রায় এবং পৌত্র সত্যজিৎ রায়—প্রত্যেকেই শিশুসাহিত্যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই গল্পটি তাঁর ‘টুনটুনির বই’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১১.১ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা দুটি বিখ্যাত বইয়ের নাম লেখো।

১১.২ তিনি ছোটোদের জন্য কোন পত্রিকা বের করতেন?

১১.৩ তাঁর সন্তানদের মধ্যে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে কারা অত্যন্ত পরিচিত?

১২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :**

১২.১ গল্পে কারা চাষ করতে গেল?

১২.২ কীসের কীসের চাষ তারা করেছিল?

১২.৩ চাষে কার লাভ এবং কার ক্ষতি হয়েছিল?

১২.৪ শিয়ালকে ঠকাতে আখচাষের সময় কুমির কী ফন্দি এঁটেছিল?

১২.৫ “‘বোকা কুমিরের কথা’ গল্পে কুমিরটা শিয়ালকে ‘তুমি বড্ড ঠকাও’ বলে দোষ দিলেও, আসলে সে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যই বার বার ঠকে গেছে।”— গল্পটি পড়ে তোমার যদি এমন মনে হয়, তবে কেন এমন মনে হলো, তা বোঝাতে গল্প থেকে তিনটি বাক্য খুঁজে নিয়ে লেখো।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : এই গানটি কবির 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় 'মুসলিম লিটারারি সোসাইটি'-র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে গানটি রচিত। ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গানটিকে 'জাতীয় সেনা সংগীত'-এর মর্যাদা দেয়।

চল্ চল্ চল্

কাজী নজরুল ইসলাম

চল্
চল্
চল্
ঊর্ধ্ব-গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্—চল্—চল্!
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নৌ-জোয়ান, শোন রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল, চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্-চল্-চল্।।

(সংক্ষেপিত)

মাস্টারদা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

সাংঘাতিক কাণ্ড। চট্টগ্রাম শহরের অল্পবয়সি কিছু ছেলে এক মাস্টারদাদার বুদ্ধিমতো ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে লড়ে তাদের গোলাবারুদের ভাণ্ডারটিকে দখল করে নিয়েছে। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সেই অস্ত্রাগারে। আগুন লাগিয়েছে টেলিফোন আর টেলিগ্রাফের অফিসেও। ট্রেনে করে যে শহরে আসবে তারও উপায় নেই। দু-জায়গায় রেলের লাইন ভেঙে ফেলেছে তারা। সেখানে মালগাড়ি উল্টে ট্রেন চলাচল বন্ধ।

চট্টগ্রাম ইংরেজ-শাসন থেকে মুক্ত, এমন এক ঘোষণা করেছে সেই ছেলের দল। ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে ইংরেজ পুলিশঘাঁটিতে উড়তে-থাকা ব্রিটিশ পতাকা—ইউনিয়ান জ্যাক। সেখানে উড়ছে স্বাধীন ভারতের পতাকা।

ভারতবর্ষ শাসন করতে এসে ইংরেজরা বোধহয় এমন মার এর আগে কমই খেয়েছে। তারা মনের সুখে রাজ্যপাট চালিয়েছে এতদিন। ভারতবাসী দিনের পর দিন খেটে গেছে আর সেই খাটুনির ফল ভোগ করেছে সাদা চামড়ার ইংরেজ। প্রতিবাদ করতে গেলেই এদেশের মানুষের কপালে জুটেছে অত্যাচার। এদেশে রাজত্ব করতে এসে তাদের স্পর্ধা একেবারে আকাশ ছুঁয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সাদা চামড়ার লোক ছাড়া অন্য কারো ঢোকার অনুমতি নেই। রেস্তোরাঁর গায়ে নোটিশ ঝুলছে— কালো চামড়ার লোক এবং কুকুরের প্রবেশ নিষেধ।

এমন অন্যায় বেশিদিন চলে না। প্রতিবাদ হবেই। প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। ঠিক যেন রূপকথার রাজপুত্রদের মতো লড়াই করে দেশ থেকে দানবদের তাড়াতে চেয়েছে চট্টগ্রামের এই ছেলের দল। তাদের মনে হয়েছে ভারতবর্ষের একটা জায়গায় যুদ্ধ করে যদি ইংরেজদের তাড়ানো যায়, সারা দেশ জেগে উঠবে। আর সকলেরই তখন মনে হবে তাহলে তো আমরাও এমনভাবে লড়াই করে ইংরেজদের অত্যাচার বন্ধ করতে পারি। তাদের তাড়াতে পারি। দেশ আমাদের মা। সেই ভারতমাতাকে ইংরেজ-দানবের কবল থেকে মুক্ত করতে পারি। এই ছেলের দলকে দেশের কথা বলে, খেলাধুলো, বন্দুক-চালানো শিখিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন এক অঙ্কের শিক্ষক। তাঁকে সবাই মাস্টারদা বলে ডাকে।

কে এই মাস্টারদা, যাঁর কথায় ছেলের দল ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়তে পারে? চট্টগ্রামের মানুষ জানে এই রোগা, সাধারণ চেহারার, ধুতি-পরা মানুষটির নাম সূর্য সেন।

কেমন মানুষ এই মাস্টারদা? সবাই কেন তাঁকে এত সম্মান করে? মাস্টারদা কথা বলেন কম। মজাটা হল, মাস্টারদাকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি এত বড়ো একজন নেতা। তাঁর পোশাক খুবই সাদাসিধে। বাঙালির ধুতি-পাঞ্জাবি বা ধুতি শার্ট। রঙিন জামা পরেন না। কথা যেমন কম বলেন, হাঁটাচলাতেও শব্দ হয় না প্রায়। তাঁর বাড়ির লোকজনেরা বলেন, খড়ম পায়ে হাঁটলেও তাঁর খটখট আওয়াজ শোনা যায় না। এই যে মানুষটি, চুপচাপ যাঁর ধরন, তিনি কী করে এত ছেলেকে ভারতের মুক্তির নেশায় খেপিয়ে তুললেন, রাইফেল-বন্দুক নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়লেন, এ ভারি আশ্চর্যের কথা।

উমাতারা হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক সূর্যকুমার সেন। নতুন মাস্টার, তাই ছেলেরা প্রথমেই বুঝে নিতে চায় লোকটি কেমন। তিনি গম্ভীর? রাশভারী? অঙ্ক ভুল হলে কড়া শাস্তি দেন? না, একটু

নরম-সরম, হাসিখুশি ? ছেলেরা অবাক হয়ে দেখল এই মাস্টারমশাই বন্ধুর মতো হাসিমুখে ছোটো-বড়ো সবার সঙ্গে মেলামেশা করছেন। খুবই সহজ, সাধারণ মানুষ, কিন্তু ঠকাবার উপায় নেই। তাঁর চোখের দিকে তাকালে কিছু লুকোনো যায় না। তখনও তো সেরকমভাবে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েনি। তবু সেদিন ছাত্রদের মনে হয়েছিল, এ মানুষটি অন্যরকম ! তাঁর কথামতো ছাত্ররা ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে ময়দানে গিয়ে ব্যায়াম করত। সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করত। কোনো কোনো ভোরবেলায় ছাত্ররা দেওয়ানজি-র পুকুরপাড়ে তাদের প্রিয় অঙ্কের মাস্টারের মেসবাড়িতে পৌঁছে গেলে দেখত, তিনি অনেক আগেই উঠে রামকৃষ্ণ-স্তোত্র গান করছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দই ছিলেন তাঁর আদর্শ পুরুষ। ছেলেদেরও তিনি এই দুই মনীষীর ভক্তি-ত্যাগ-তেজস্বিতার আদর্শে গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এত প্রিয়, তিনি বলতেন ‘কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ’। শুধু বলা নয়, রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ। পরে জালালাবাদের পাহাড়ে লড়াইয়ের আগেও রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা শুনেছেন তিনি। জেলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছেন, চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন উদ্ধৃত করেছেন। সাথিদের তাঁর কবিতা পড়তে অনুরোধ করে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভারতবর্ষের এক মস্ত বড়ো সম্পদ।

তবে, উমাতারা স্কুলের ছাত্ররা সেদিন অঙ্কের শিক্ষক সূর্যকুমার সেনকে একটু অন্য নজরে দেখলেও, বুঝতেই পারেনি এই মানুষটি একদিন শক্তিশালী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বেন। তিন দিনের জন্য হলেও চট্টগ্রামকে বিদেশি শাসন মুক্ত করবেন।

১. **নিজে নিজে লেখো :**

১.১ আমাদের দেশের নাম কী?

১.২ আমাদের দেশে স্বাধীনতা দিবস কোন দিনটিতে পালিত হয়ে থাকে?

১.৩ আমাদের দেশ কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে?

১.৪ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন এমন দুজন বীর বিপ্লবীর নাম লেখো।

১.৫ চট্টগ্রাম শহরটি বর্তমানে কোন দেশে অবস্থিত?

২. **নীচের এলোমেলো শব্দগুলি সাজিয়ে লেখো :**

মু ন স শা ক্ত ______ র কু ড় পা পু______ ক ন্য অ র ম ______

টি পু লি ঘাঁ শ ______ তা ভা র মা ত______ রু বা গো দ লা ______

শব্দার্থ : ভাণ্ডার —ভাঁড়ার ঘর। মুক্ত — স্বাধীন। খাটুনি — পরিশ্রম। মনীষী — জ্ঞানী। উদ্ধৃত — কোনো রচনা থেকে নেওয়া। অস্ত্রাগার — গোলা-বারুদ-বন্দুক এইসব অস্ত্রশস্ত্র রাখা থাকে যেখানে।

৩. **অর্থ লেখো :** স্বাধীন, সাথি, সম্মান, সাদাসিধে, স্তোত্র।

৪. **নীচের শব্দগুলির যা অর্থ, সেই একই অর্থ বোঝায় এমন শব্দ মাস্টারদার কাহিনিতে রয়েছে, বুঝে নিয়ে শব্দগুলো লেখো :**

দৈত্য ______ নগর ______ যুদ্ধ ______

যোগ্য ______ অবাক ______ ঐশ্বর্য ______

কমবয়স যার ______ ভয়ঙ্কর কাণ্ড______

৫. **বাক্য রচনা করো :** পতাকা, মা, দেশ, মুক্তি, ব্যায়াম।

৬. **একটি, দুটি, তিনটি, চারটি, পাঁচটি, ছয়টি শব্দের বাক্য 'মাস্টারদা' রচনাংশ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

রাশভারী। (একটি শব্দের বাক্য)

-- (দুটি শব্দের বাক্য)

-- (তিনটি শব্দের বাক্য)

-- (চারটি শব্দের বাক্য)

-- (পাঁচটি শব্দের বাক্য)

-- (ছয়টি শব্দের বাক্য)

৭. **চট্টগ্রামের ছেলেরা আগুন লাগিয়েছিল <u>টেলিফোন</u> <u>টেলিগ্রাফে</u>র <u>অফিসে</u>।**
কথা বলবার সময় নীচে দাগ দেওয়া শব্দগুলোর মতো এমন অনেক বিদেশি শব্দই আমরা ব্যবহার করি। একেবারেই ইংরেজি শব্দ বলে চিনতে পারছ, এমন আর কী কী শব্দ খুঁজে পাও মাস্টারদার কাহিনিতে?

৮. **'মাস্টারদা' শব্দটার মধ্যে একটা বিদেশি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা বাংলা শব্দ :**

মাস্টার + দা (দা) = মাস্টারদা

এইরকমই আর একটি শব্দ, ধরো মাস্টার + মশাই (মশাই) = মাস্টার মশাই

এইরকম শব্দ তুমি আর কটি লিখতে পারবে?

৯. **বিদেশি শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দ যুক্ত হয়নি, কিন্তু দুটো শব্দ মিলেমিশে একটাই কথা তৈরি করেছে, এমন কিছু কথা রয়েছে নীচে, এইসব কথাগুলো থেকে শব্দ দুটোকে আলাদা করে লেখো :**

গোলাবারুদ ________ খেলাধুলো ________ রাজ্যপাট ________

ভারতমাতা ________ শাসনমুক্ত ________ ইংরেজদানব ________

১০. 'মরণপণ' কথাটার মধ্যে যে দুটো শব্দ আছে, তার শেষের শব্দ 'পণ'। ছোটো দলে আগে নিজেরা আলোচনা করে দেখো, শেষে 'পণ' যোগ করে আর কী কী শব্দ লিখতে পারবে?

১১. 'খেলাধুলো' 'নরম- সরম' এইরকম শব্দ রয়েছে 'মাস্টারদা'র গল্পে। এখানে একটা শব্দেই জড়ানো রয়েছে দুটো শব্দ, প্রথম শব্দটার মানেই যেখানে আসল, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে এসেছে দ্বিতীয় শব্দটা, সব সময় যার তেমন মানে নেই। এই ধরনের আর কটি শব্দ মাস্টারদার কাহিনিতে খুঁজে পাও, নিজেরা বার করো।

কোনো কোনো সময় আবার এইরকম দুটো শব্দের মানেই এক, 'হাঁটা-চলা' বা 'রাইফেল-বন্দুক' যেমন। এরকম কয়েকটি শব্দ নিজে লেখো।

১২. মাস্টারদা হাসিমুখে মেলামেশা করতেন <u>ছোটো-বড়ো</u> সবার সঙ্গে।
এইরকম জোড়া শব্দ, যার একটির মানে অন্যটির বিপরীত,কয়েকটি লেখো।

১৩. **নীচে দেওয়া শব্দগুলি থেকে কোনটা বিশেষ্য কোনটা বিশেষণ খুঁজে নিয়ে লেখো :**
(একটি দেখানো রইল তোমার জন্য)

শক্তিশালী, সম্পদ, উদ্ধৃত, রাশভারী, শক্তি,সম্মান, স্বাধীন, অত্যাচার, শাসন, অনুরোধ

বিশেষ্য	বিশেষণ
	শক্তিশালী

১৪. নীচের বিশেষ্য শব্দগুলি বিশেষণে বদলে ফেলো। বিশেষণ শব্দগুলো পাবে শব্দঝুড়িতে। খুঁজে নিয়ে ঠিক শব্দের পাশে বসাও :

বিশেষ্য	বিশেষণ
অত্যাচার	অত্যাচারিত
মুক্তি	
ভক্তি	
ত্যাগ	
শাসন	
স্পর্ধা	
সম্মান	
ঘোষণা	
সুখ	
তেজস্বিতা	
প্রতিবাদ	

স্পর্ধিত, মুক্ত, শাসিত, সুখী, প্রতিবাদী, ভক্ত, সম্মানিত, ত্যক্ত, তেজস্বী, ঘোষিত

১৫. নীচের বিশেষণ শব্দগুলি বিশেষ্যে বদলাও। বিশেষ্য শব্দগুলি পাবে শব্দঝুড়িতে। খুঁজে নিয়ে ঠিক শব্দের পাশে বসাও :

বিশেষণ	বিশেষ্য
গম্ভীর	
রঙিন	
উদ্ধৃত	
বিদেশি	
মনীষী	

রং, উদ্ধৃতি, গাম্ভীর্য, বিদেশ, মনীষা

১৬. নীচের বাক্যগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো তো কোন কোন শব্দে তোমার মনে হচ্ছে কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর কোন কোন শব্দে তোমার মনে হচ্ছে কাজ এখনো শেষ হয়নি, সেগুলো আলাদা করে লেখো :

১৬.১ এদেশে রাজত্ব করতে তাদের স্পর্ধা একেবারে আকাশ ছুঁয়েছে।

১৬.২ উমাতারা স্কুলের ছাত্ররা সেদিন অঙ্কের শিক্ষককে...অন্য নজরে দেখলেও, বুঝতেই পারেনি এই মানুষটি...ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বেন।

১৬.৩ তাদের মনে হয়েছে, ভারতবর্ষের একটা জায়গায় যুদ্ধ করে যদি ইংরেজদের তাড়ানো যায়, সারা দেশ জেগে উঠবে।

১৭. উমাতারা হাইস্কুলের অঙ্ক-শিক্ষককে তোমার কেমন লাগল, এইভাবে লেখো :

উমাতারা হাইস্কুলের অঙ্ক-শিক্ষকের নাম _______ _______। সাদাসিধে মানুষটিকে দেখে সব সময়ে বোঝা যেত না তিনি কতখানি _______। তাঁর ছাত্ররা তাঁকে _______ _______, _______। তিনি ভালোবাসতেন _______ _______। তিনি চেয়েছিলেন _______ _______ _______ _______। এই মানুষটিকে আমার _______ _______।

১৮. উমাতারা হাইস্কুলের অঙ্ক-শিক্ষকের প্রিয় কবি কে ছিলেন? এ গল্প থেকে তা কেমন করে জানতে পারো ?

১৯. কোন কবির কবিতা পড়তে তোমার খুব ভালো লাগে? তাঁর যে কবিতাটি তোমার সবচেয়ে পছন্দ, সেটির দুটি পঙ্‌ক্তি লিখতে পারো?

২০. পাঠ্য অংশটি পড়ে নিজে লেখো :

২০.১ ‘আগুন লাগিয়েছে টেলিফোন আর টেলিগ্রাফের অফিসেও’।—কারা এমন করেছিল? কেন করেছিল?

২০.২ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে কোন পতাকা উড়ত? তার বদলে বিপ্লবীরা কেমন পতাকা ওড়ালেন?

২০.৩ ইংরেজ-আমলে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজরা কেমন আচরণ করত?

২০.৪ ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ কীভাবে মাস্টারদার নেতৃত্বে রুখে দাঁড়িয়েছিল?

২০.৫ মহান বিপ্লবীদের ছবি সংগ্রহ করো, খাতায় লাগাও, সেখানে তাঁদের জীবনকথা জেনে নিয়ে সংক্ষেপে লিখে রাখো।

অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৫৫): প্রধানত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে লেখালেখি করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা বিষয়ে ছোটোদের জন্য ছড়া আর গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই — ‘টেগার্টের আন্দামান ডায়েরি’ এবং বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জীবনী নির্ভর উপন্যাস ‘অগ্নিপুরুষ’। পাঠ্যাংশটি তাঁর ‘সূর্য সেন’ বইটি অবলম্বনে লিখিত।

মুক্তির মন্দির সোপানতলে

মোহিনী চৌধুরী

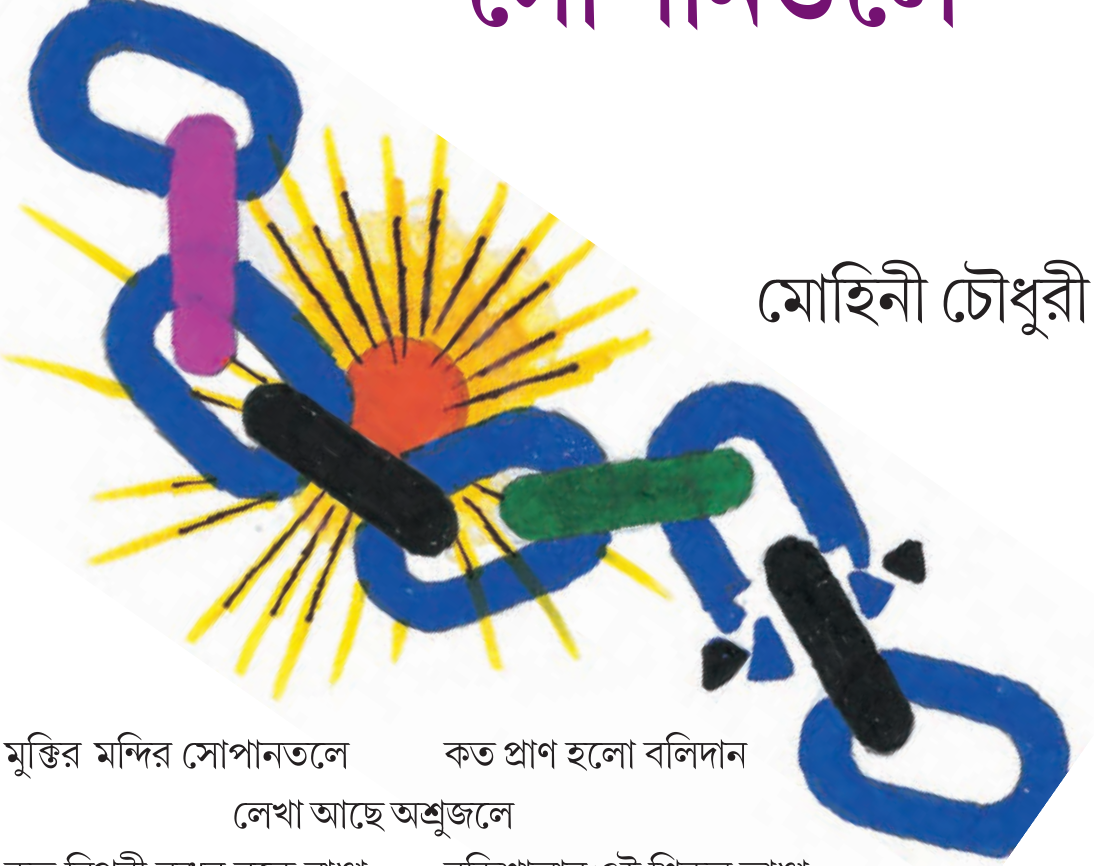

মুক্তির মন্দির সোপানতলে   কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা   বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা,
তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে,
যত তরুণ-অরুণ গেল অস্তাচলে?
যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি,
আজ স্বদেশব্রতে মহাদীক্ষা লভি সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।
যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগাল আশা, মৌন মলিন মুখে জাগাল ভাষা,
আজ রক্তকমলে গাঁথা মাল্যখানি বিজয়লক্ষ্মী দেবে তাদের-ই গলে।।

মোহিনী চৌধুরী : জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। পঞ্চাশ-ষাট দশকের বিখ্যাত গীতিকার। শচীন দেববর্মণ, জগন্ময় মিত্র, মীরা দেববর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভি. বালসারা, মান্না দে প্রমুখের সুরে ও কণ্ঠে তাঁর গানগুলি আজও বিশেষ জনপ্রিয়।

মিষ্টি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যে আকাশে ঝড় ওঠে না
মেঘ ডাকে না,
—চাই কি?
রোদ ওঠে না জল পড়ে না,
ভালো লাগে তাই কি?

যে পথে নেই পিছলে পড়া,
হোঁচট খাওয়া, দুখ্‌খু,
গড়িয়ে যেতে সে পথে যে
পায় মজা সে মুখ্‌খু!

রাস্তা হোক না চড়াই-ভাঙা
অনেক অনেক দূর।
আকাশে থাক ঝড় বৃষ্টি,
আর কিছু রোদ্দুর।

তাতেই হবে, তাইতে।
চিবিয়ে খেতে হয় বলে আখ
মিষ্টি সবার চাইতে!

হাতে কলমে

১. **নিজের ভাষায় লেখো :**

১.১ কোন ঋতুতে সাধারণত আকাশে ঝড় ওঠে না, মেঘ ডাকে না?

১.২ কোন ঋতুতে সাধারণত পথ-ঘাট পিছল হয়ে পড়ে?

১.৩ কোন পথে সহজেই গড়িয়ে পড়া যায়?

১.৪ চড়াই-উৎরাই রাস্তা কোথায় দেখা যায়?

১.৫ 'রাস্তা' শব্দটি অন্য কোন নামে কবিতায় আছে?

১.৬ আখের প্রসঙ্গ রয়েছে, তোমার পাঠ্যসূচির এমন অন্য একটি রচনার নাম লেখো।

শব্দার্থ : পিছলে— হড়কে যাওয়া বা পড়া। চড়াই— নীচ থেকে ওপরে ওঠার খাড়া রাস্তা।

২. **নীচের এই শব্দগুলো মূল কোন কোন শব্দ থেকে এসেছে :**

আখ ____________ রোদ্দুর ____________

৩. **'চড়াই' ও 'পড়ে'— এই দু'টি শব্দের দু'টি করে অর্থ লেখো, বাক্যে ব্যবহার করো।**

৪. **তোমার স্কুলে যাওয়ার, খেলতে যাওয়ার, আর বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার রাস্তাগুলো কেমন, তিনটে রাস্তা নিয়ে আলাদা আলাদা দুটো করে বাক্য লেখো। এ প্রসঙ্গে কোন রাস্তাটি তোমার কেন ভালো লাগে, তার পক্ষে দুটি যুক্তি দাও।**

৫. **কষ্টের বিনিময়ে পাওয়া যে সুখ তা-ই প্রকৃত সুখ। কবিতায় এই কথাটি কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে লেখো।**

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) : রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কবি, গল্পকার । ছোটোদের জন্য সৃষ্টি করেছেন 'ঘনাদা'। এছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি, রোমাঞ্চকর কাহিনি, গোয়েন্দা গল্প এই সব ধরনের রচনাতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। ১৯২৬ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার কবি হিসাবে তাঁর প্রথম খ্যাতি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফেরা', 'হরিণ-চিতা-চিল' ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি প্রচুর সার্থক ছোটোগল্প লিখেছেন।

৬.১ ছোটোদের প্রিয় চরিত্র 'ঘনাদা' কার সৃষ্টি?

৬.২ প্রেমেন্দ্র মিত্র কোন সাহিত্য-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

৬.৩ তাঁর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

৭. **কোন কোন মিষ্টি খাবার তোমার খেতে ভালো লাগে, নীচের মানস মানচিত্রে সেগুলির নাম লেখো:**

এই মিষ্টিগুলি নিয়ে এক-একটা বাক্য লেখো।

৮. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :**

৮.১ নীচের কোন ছবিতে কোন ঋতুর আকাশ কেমন, তা ছবি দেখে নিজের ভাষায় বাক্সের মধ্যে লেখো :

৮.২ এইরকম অন্য কোনো ঋতুর আকাশ সম্পর্কে লেখো।

তালনবমী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝমঝম বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন পনেরো ধরে বর্ষা নেমেচে, তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভট্‌চাজের বাড়ি আজ দুদিন হাঁড়ি চড়ে নি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমিজমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্যযজমানের বাড়ি ঘুরে-ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়িতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে,—ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান-বাড়ি থেকে যে কটি ধান এসেছিল তা ফুরিয়ে গিয়েচে। —ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষিদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়স বছর বারো, গোপালের দশ। কদিন থেকে পেট ভরে না খেতে পেয়ে ওরা দুই ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেচে।

নেপাল বললে, 'এই গোপলা, খিদে পেয়েচে না তোর?'

গোপাল ছিপ চাঁচতে চাঁচতে বললে, 'হুঁ', দাদা!'

'মাকে গিয়ে বল; আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।

'মা বকে; তুমি যাও দাদা!'

'বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?'

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনিকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে, 'ও চুনি, শুনে যা!'

চুনি বয়সে নেপালের চেয়ে বড়ো। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে, বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী?'

'আয় না ভেতরে।'

'না যাব না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি পিসিমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েছে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।'

'কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?'

'ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবার; ওদের বাড়ি লোকজন খাবে।'

'সত্যি?'

'তা জানিস নে বুঝি? আমাদের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করবে, গাঁয়েও বলবে।'

'আমাদেরও করবে?'

'সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?'

চুনি চলে গেলে নেপাল ছোটো ভাইকে বললে, 'আজ কী বার রে? তা তুই কি জানিস? আজ শুক্কুরবার বোধ হয়—মঙ্গলবারে নেমন্তন্ন।'

গোপাল বললে, 'কী মজা! না দাদা?'

‘চুপ করে থাক,—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই; তালনবমীর বের্তোয় তালের বড়া করে, তুই জানিস?’

গোপাল সেটা জানত না! কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশি হয়ে উঠল। সত্যিই তা যদি হয়, তবে সে সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেচে কাছে। আজ কী বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে— নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ি যাবার পথে পড়ে জটি পিসিমার বাড়ি। নেপাল বললে, ‘তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ি ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ি তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে!’

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদিঘি, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটি পিসিমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী; গ্রামসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসিমা।

পিসিমা বললেন, ‘কী রে?’

‘তাল নেবে পিসিমা?’

‘হ্যাঁ, নেব বই কি। আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।’

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েচে। জটি পিসিমা বললেন, ‘পেছনে কে রে? গোপাল? তা সন্ধেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?’

নেপাল সলজ্জমুখে বললে, ‘মাছ ধরতে।’

‘পেলি?’

‘ওই দুটো পুঁটি আর একটা ছোটো বেলে... তাহলে যাই পিসিমা?’

‘আচ্ছা, এসো গে বাবা, সন্ধে হয়ে গেল ; অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।’

জটি পিসিমা তাল সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ দেখালেন না বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না,—যদিও দু’জনেরই আশা ছিল হয়তো জটি পিসিমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন। দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিগ্যেস করলে, ‘তাল নেবেন তা হ’লে?’

'তাল? তা দিয়ে যেও বাবা। কটা করে পয়সায়?'

'দুটো করে দিচ্ছি পিসিমা। তা নেবেন আপনি, তিনটে করেই নেবেন।'

'বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।'

'মিশকালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।'

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে, 'কবে তাল দিবি দাদা?'

'কাল।'

'তুই ওদের কাছে পয়সা নিস নে দাদা।'

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কেন রে?'

'তাহলে আমাদের নেমন্তন্ন করবে, দেখিস এখন।'

'দূর, তা হয় না! আমি কষ্ট করে তাল কুড়োব—আর পয়সা নেব না?'

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু হু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পুবদিকের জানলার কপাট দড়িবাঁধা; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খট্ খট্ শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবচে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে,—তবে ওরা আর নেমন্তন্ন করবে না! তা কখনো করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখনও ওঠেনি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েচে,—সামান্য একটু টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদিঘির ধারে। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে, 'কী খোকাঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?'

'তাল কুড়ুতে দিঘির পাড়ে।'

'বড্ড সাপের ভয় খোকাঠাকুর! বর্ষাকালে ওখানে যেও না একা-একা।'

গোপাল ভয়ে ভয়ে দিঘির তালপুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগল। বড়ো আর কালো কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসবার পথে আরও গোটা-তিনেক ছোটো তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, এত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই, দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটি পিসিমার বাড়ি হাজির।

জটি পিসিমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোরগোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কী রে খোকা?'

গোপাল একগাল হেসে বললে, 'তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসিমা!'

জটি পিসিমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে, তালনবমী কবে জিগ্যেস করে; কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে মুখ উঁচু করে দেখে—নারকোল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়চে, বাঁশঝাড় নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়, বকুলতলার ডোবায় কটকটে ব্যাঙের দল থেকে থেকে ডাকচে।

গোপাল জিগ্যেস করলে, 'ব্যাঙগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?'

গোপালের মা বলেন, 'নতুন জলে ডাকে, এখন পুরোনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।'

'আজ কী বার, মা?'

'সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কী দরকার?'

'মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?'

'তা হয়তো হবে। কী জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল

জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কী দরকার আমার?'

সারাদিন কেটে গেল। নেপাল বিকেলের দিকে জিগ্যেস করলে, 'জটি পিসিমার বাড়িতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে পিসি বললেন, 'গোপাল তাল দিয়ে গেচে, পয়সা নেয়নি।'—কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!'

'ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা, কাল তো তালনবমী!'

'সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে, পয়সা নিলেও করবে। তুই একটা বোকা!'

'আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার না?'

'হুঁ।'

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ির পাশের বড়ো বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে; জানালা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে—কাল সকালটা হলে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!...

জটি পিসিমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়, 'খোকা, কাঁকুড়ের ডাল্‌না আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।' জটি পিসিমার বড়ো মেয়ে লাবণ্য দি একখানা থালায় গরমগরম তিলপিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললে, 'খোকা, কখানা নিবি তিলপিটুলি?'—বলেই লাবণ্যদি থালাখানা উপুড় করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তারপর জটি পিসিমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন, 'খোকা যে তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হলো!...খা, খা, খুব খা; —আজ যে তালনবমী রে!' ...কত কী চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ বাতাসে! খেজুর গুড়ের পায়েসের সুগন্ধ বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠল। সে বসে বসে খাচ্ছে, কেবলই খাচ্ছে!...সবারই খাওয়া শেষ, ও তবুও খেয়েই যাচ্ছে...লাবণ্য দি হেসে হেসে বলছে, 'আর নিবি তিলপিটুলি?'...

'ও গোপাল?'

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানালার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপঝাড়, তাদের সেই আতা গাছটা...সে শুয়ে আছে তাদের বাড়িতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেচে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলচেন, 'ওঠ, ওঠ, বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না।'

বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'আজ কী বার মা.. ?'

'মঙ্গলবার।'

তাও তো বটে! আজই তো তালনবমী! ঘুমের মধ্যে ওসব কী হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়ল, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েচে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইল। বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা শিরশির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইল বটে, কিন্তু কই, পিসিমাদের বাড়ি থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এল না!

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড়ো ছেলে পাঁচু আর ও-পাড়ার হরেন...

গোপাল ভাবলে এরা যায় কোথায়?

এ-দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্চাজ ও তার ছোটো ভাই দীনু, সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে।

দীনু ভট্চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে, 'এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?'

গোপাল বললে, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা?'

'জটি পিসিমাদের বাড়ি তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। করেনি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেছে কি না, সবাইকে তো বলেনি...'

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? আমরা এর পরে যাব...'

রাগ করবার মতো কী কথা সে বলেচে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক হয়ে বললে, 'বা রে! তা অত রাগ করিস কেন? কী হয়েচে?'

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়ল—বোধহয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হলো! তার সজল ঝাপসা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুট্‌কে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ির সামনে দিয়ে জটি পিসিমাদের বাড়ির দিকে চলে গেল...

হাতে কলমে

১. জেনে নিয়ে নিজের ভাষায় লেখো :

১.১ কোন মাসে তাল পাকে?

১.২ আউশ ধান কোন ঋতুতে ঘরে ওঠে?

১.৩ গ্রাম জীবনে পালিত হয়, এমন দুটি ব্রত, পরব বা অনুষ্ঠানের নাম লেখো।

১.৪ বর্ষাকালে অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় কেন?

১.৫ তাল থেকে তৈরি কোন কোন খাবার তোমার প্রিয়?

২. নীচের এলোমেলো বর্ণগুলো সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

হু দূ র ব র্তী র :	র পা ত্ত উ ড়া :	অ ম স্ক ন ন্য :
ল পি তি লি টু :	ল ঙ্গ বা র ম :	কু ঠা খো র কা :

শব্দার্থ : বহুদূরবর্তী— অনেক দূরে থাকা; অবস্থাপন্ন— ধনশালী, অর্থবান; যজমান— যিনি যজ্ঞ করান, পুরোহিত যার মঙ্গলের জন্য পুজো করেন। তালনবমী ব্রত— ভাদ্রমাসের ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্ল নবমী তিথিতে ব্রত পালন করা হয়। বিষ্ণুকে তাল ফল দান করে এই ব্রত পালিত হয়।

৩. অর্থ না বদলে নীচের বাক্যগুলো শব্দঝুড়ির সাহায্য নিয়ে অন্যভাবে লেখো :

(একটা তোমার জন্য করে দেওয়া হলো)

বৃষ্টির/বর্ষার, খিদে পেয়েছে, সাহস হয় না, রাত কাটবে, হেলে পড়ছে।

৩.১ ক্ষুদিরাম ভট্‌চাযের বাড়ি দুদিন হাঁড়ি চড়েনি।
যেমন : ক্ষুদিরাম ভট্‌চাযের বাড়ি দুদিন রান্না হয়নি।

৩.২ কতক্ষণে যে রাত পোহাবে।

৩.৩ কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার ।

৩.৪ আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।

৩.৫ বাঁশঝাড় নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়।

৪. **ঘটনাক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে লেখো :**

৪.১ ঘুমের মধ্যে ওসব কী হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল।

৪.২ ক্ষুদিরাম ভট্‌চাজের বাড়ি দুদিন হাঁড়ি চড়েনি।

৪.৩ গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদিঘির ধারে।

৪.৪ গোপাল বললে, ‘কোথায় যাচ্ছিস তোরা?’

৪.৫ ‘ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা, কাল তো তালনবমী।’

৫. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :**

৫.১ গল্পের নানান জায়গায় খুঁজে দেখো ‘তাল’ নামে ফলটার অনেক ধরনের বিশেষণ খুঁজে পাবে। সবগুলো লেখো।

৫.২ ‘মেঘাচ্ছন্ন আকাশ’ কথাটার অর্থ মেঘে ভরা আকাশ। ঠিক এই অর্থটাই বোঝায় এমন আর একটা বিশেষণ গল্পেই আছে। খুঁজে নিয়ে লেখো।

৬. **শব্দঝুড়ি থেকে কোনটি কী ধরনের শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :**

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া

তার, নেমন্তন্ন, বোকা, দিয়েছিল, মঙ্গলবার, আকাশ, ঝমঝম, চলাফেরা, প্রকাণ্ড, মিশকালো, চুঁই চুঁই, তিনি।

৭. **নীচের বাক্যগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো কোন কোন শব্দে তোমার মনে হচ্ছে কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর কোন কোন শব্দে মনে হচ্ছে কাজ এখনও শেষ হয়নি, সেগুলো আলাদা করে লেখো :**

৭.১ কদিন ধরে পেট ভরে না খেতে পেরে ওরা দুই ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

৭.২ জটি পিসিমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

৭.৩ রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ‘কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন?’

৭.৪ খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে।

৮. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

৮.১ 'সদর দোর' কথাটার মানে জেনে নাও, শব্দটা নিজে কোনো বাক্যে ব্যবহার করো।

৮.২ 'কপাট' শব্দটির অর্থ লেখো। এই শব্দটা ব্যবহার করে নিজে একটি বাক্য লেখো।

৯. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো:

সলজ্জ, সুখাদ্য, অন্ধকার, সাধ্য, আগ্রহ

১০. বাক্য রচনা করো:

গৃহস্থ, পিঠে, আশ্চর্য, জোনাকি, তালনবমী

১১. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

১১.১ এ গল্পে বৃষ্টির দুরকম ছবি আছে। ঝম্‌ঝম্ আর টিপ্‌টিপ্। এই শব্দ দুটো ছাড়া কেবল ধ্বনি থেকেই বুঝে নেওয়া যায়, এমন কতগুলো শব্দ লেখো।

১১.২ হাওয়ার শব্দ বোঝাচ্ছে এমন দুটি শব্দ গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

১১.৩ গল্পে 'বাঁড়ুজ্যে, ভট্‌চাজ'—এগুলি কোন কোন পদবি থেকে এসেছে? এরকম আরো তিনটি পদবি লেখো।

১১.৪ পড়েচে, খেয়েচে—এই শব্দগুলি কোন কোন শব্দ থেকে এসে এরকম চেহারা পেয়েছে?

১২. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

১২.১ এই গল্পটা কোন ঋতুর, তা বোঝবার অনেকগুলো সূত্র গল্পটার মধ্যে ছড়ানো আছে। আছে মাসের নাম, ব্রতের নাম ইত্যাদি। এছাড়াও কোন কোন সূত্র তুমি নিজে খুঁজে পাও লেখো।

১২.২ এ গল্পে দাদা এক সময়ে ছোট ভাইকে বলেছে, 'একটা বোকা!' তোমার কি সত্যি মনে হচ্ছে ভাইটা বোকামিই করেছে? ছোটো ভাই, যার নাম গোপাল, সে যদি তোমার বন্ধু হতো, তবে তুমি তাকে কী করতে বলতে?

১২.৩ কী ধরনের বৃষ্টি তোমার পছন্দ এবং কেন তা বুঝিয়ে লেখো।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) : জন্মস্থান বনগ্রাম, চব্বিশ পরগনা। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই—‘পথের পাঁচালী’, ‘আরণ্যক’, ‘অপরাজিত’, ‘ইছামতী’, ‘দেবযান’, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’, ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’, ‘কিন্নরদল’ ইত্যাদি। কিশোরদের জন্য রচিত অভিযান বিষয়ক রচনা—‘চাঁদের পাহাড়’ প্রতিটি বাঙালির অবশ্যপাঠ্য। মৃত্যুর পরে ১৯৫১ সালে তাঁকে ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ প্রদান করা হয়।

পাঠ্য গল্পটি তাঁর ‘তালনবমী’ নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৩.১ ‘পথের পাঁচালী’ বইটির লেখক কে?

১৩.২ তাঁর লেখা ছোটোদের দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১৩.৩ কত সালে তাঁকে ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ প্রদান করা হয়?

১৪. পাঠ্য অংশটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

১৪.১ গল্পে মোট কটি শিশু চরিত্রের কথা আছে? তাদের নাম পরিচয় লিখে তাদের স্বভাব বিষয়ে দুটি করে বাক্য লেখো।

১৪.২ ভরা বর্ষায় ক্ষুদিরাম ভট্চাজের দিন কীভাবে কাটে?

১৪.৩ চুনির মা জটি পিসিমার বাড়ি গিয়েছিল কেন?

১৪.৪ জটি পিসিমার বাড়িতে কী বারে, কেন তালের প্রয়োজন হয়েছিল?

১৪.৫ কে, কীভাবে জটি পিসিমাকে তাল জোগাড় করে এনে দিয়েছিল?

১৪.৬ জটি পিসিমার ভালো নামটি কী?

১৪.৭ বর্ষারাতে গোপালের দেখা স্বপ্ন কীভাবে মিথ্যা হয়ে গেল, তা গল্প অনুসরণে লেখো।

শরৎ তোমার

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।।
শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।।
মানিক-গাঁথা ওই-যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গিতে,
শিউলি বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

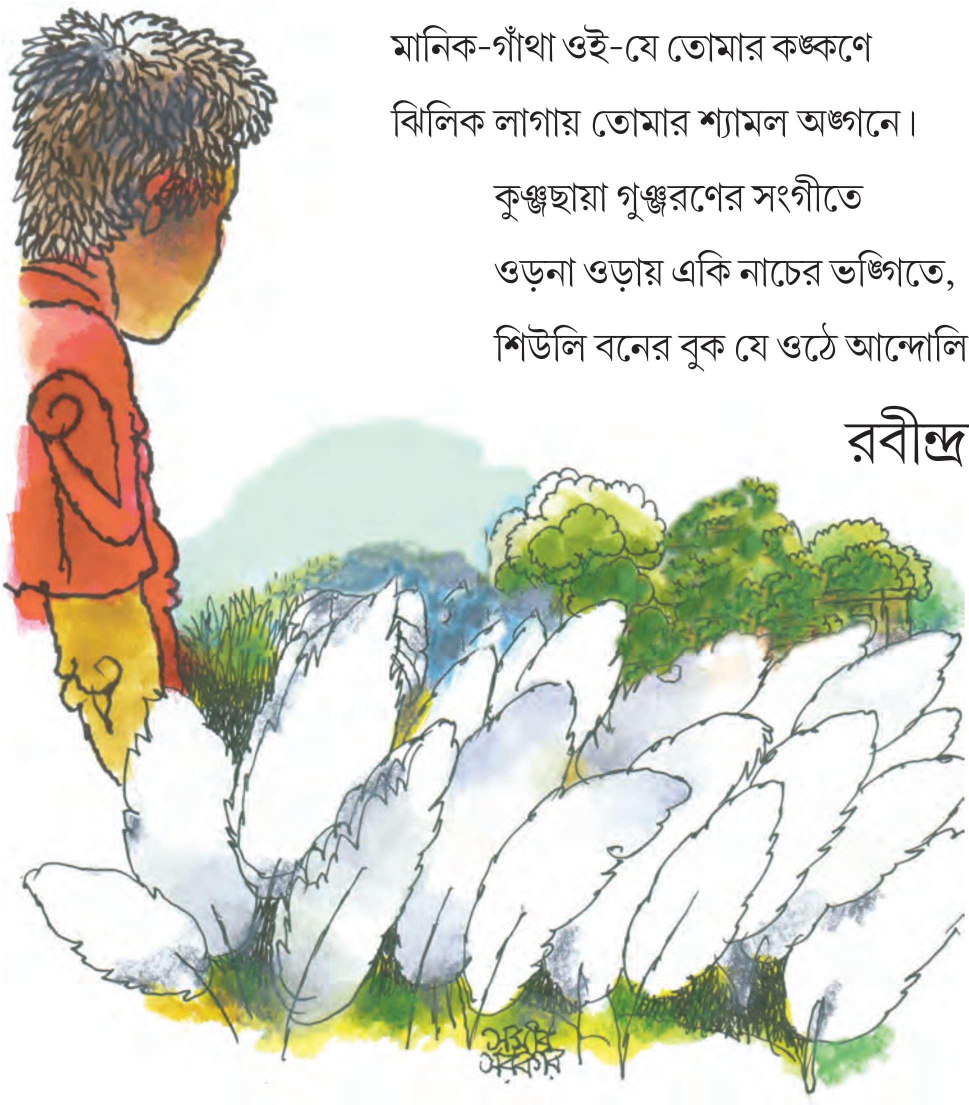

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি ‘গীতিবিতান’ নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে ‘স্বরবিতান’ নামের বইয়ে। এই গানটি ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ভুক্ত।

একলা

শঙ্খ ঘোষ

আমি যখন একলা থাকি তখন কি আর একলা থাকি
জানো তখন সঙ্গে থাকে কারা?
থাকে সবুজ গাছপালা আর তার ভিতরে চলে যাওয়ার
পথও থাকে, ঠিক যদি দিই সাড়া।
একটা আছে কাঠবেড়ালি আমার দিকে তাকায় খালি
এদিক-ওদিক টানতে থাকে আমায়—
যেই-না তাকে ধরতে যাব ভুলিয়ে দেয় সব হিসাব ও
ছুট দেয় আর কেই-বা তখন থামায়!
সেই ছুটে ছুট লাগাই জোরে এই মাটিতে এই পাথরে
কদ্দূরে—কেউ জানতে পারে না তা
মস্ত আশীর্বাদের মতো মাথার উপর ইতস্তত
গাছের থেকে ঝরতে থাকে পাতা।
তখন আমি একলা তো নই থাকে না আর দুঃখ কোনোই
শালবনে বা তালসুপুরির বনে
ঘর-বার সব এক হয়ে যায় চুপ-থাকাটাও বাজনা বাজায়
তখন আমার একলা মনের কোণে।

১. নিজের ভাষায় লেখো :

১.১ তুমি কখন একলা থাকো?

১.২ সবুজ গাছপালায় ছাওয়া পথ তুমি কোথায় দেখেছ? সে পথে চলতে তোমার কেমন লেগেছে?

১.৩ কত রঙের, কত রকমের পাথর তুমি দেখেছ?

১.৪ গাছের থেকে কোন ঋতুতে পাতা ঝরে? কোন কোন গাছ থেকে পাতা ঝরতে তুমি দেখেছ?

১.৫ গাছ আমাদের কী কী দেয় তা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

১.৬ পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় 'শালবন' রয়েছে? শালপাতাকে মানুষ কী কী ভাবে ব্যবহার করে?

১.৭ 'বাজনা' শব্দটা শুনলে তোমার চোখে কোন কোন ছবি ভেসে ওঠে? কোন কোন বাজনার নাম তুমি জানো? কোন কোন বাজনা বাজতে দেখেছ তুমি?

২. নীচের কথাগুলো তুমি মুখে বললে যেভাবে বলতে, সেইভাবে সাজিয়ে লেখো :

২.১ ভুলিয়ে দেয় সব হিসাব ও

____

২.২ থাকে না আর দুঃখ কোনোই

____

২.৩ ঠিক যদি দিই সাড়া

____

৩. নীচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে দেখো চেনা চেহারা পায় কিনা :

পু রি তা সু ল — লি ড়া কা বে ঠ

লা পা ছ গা — ত ত স্ত ই

শব্দার্থ : ইতস্তত—এখানে-ওখানে।

৪. 'এদিক-ওদিক'— এই কথাটায় এক ধরনের শব্দেরা যেমন পাশাপাশি বসে আছে, সেইরকম পাশাপাশি বসে-থাকা শব্দ পারলে নিজেই লেখো, নয়তো খুঁজে নাও শব্দঝুড়ি থেকে।

এপার —   একাল —

এখানে —   এরকম —

ওখানে, সেরকম, সেকাল, ওপার

৫. ‘ঘর-বার’ এইরকম পাশাপাশি বসে থাকা উল্টো কথা তুমি ক’টা জানো লেখো।

____

৬. **শব্দঝুড়ি থেকে খুঁজে বার করো নীচের কোন শব্দটার সঙ্গে কোন শব্দটার বিপরীত সম্পর্ক আছে :**

মস্ত : দুঃখ : আশীর্বাদ :

অভিশাপ, ছোট্ট, সুখ

৭. **নীচের দাগ দেওয়া শব্দগুলো দেখে বিশেষ্য বিশেষণ আলাদা করে লেখো :**

৭.১ আমি যখন একলা থাকি...

৭.২ থাকে সবুজ গাছপালা...

৭.৩ মস্ত আশীর্বাদের মতো মাথার উপর ইতস্তত...

৭.৪ গাছের থেকে ঝরতে থাকে পাতা।

৮. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলোকে বিশেষণে বদলালে কী হবে :**

গাছ : বন : দুঃখ :

পাথর : মাটি :

গেছো, বুনো, দুঃখী/ দুঃখিত, পাথুরে, মেটে

৯.১ তুমি যখন একলা থাকো, তখন তোমার কেমন লাগে? মন খারাপ লাগে / ভয় করে / ভালোই লাগে / ইচ্ছে করে অন্তত একজন-দুজন প্রিয় বন্ধু সঙ্গে থাকুক।

এইগুলোর কোনোটা যদি তোমার মনে হয়, তবে সেই কথাটাই নীচের বাক্যে লেখো, কিংবা, এগুলো ছাড়া আরো অন্য কোনো কথাই যদি মনে আসে, তবে লেখো সেই কথাটাই :

আমি যখন একলা থাকি, তখন আমার ____________________।

৯.২ কোন গাছ তোমার সবচেয়ে পছন্দের? ____________________।

সে গাছ কি তুমি দেখেছ? ____________________।

কেন ওই গাছকেই সবচেয়ে ভালো লাগে তোমার?

____________________ গাছটাকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে কারণ ____________________।

৯.৩ কেমন বন্ধু তোমার ভালো লাগে?

আমার ভালো লাগবে যদি আমার বন্ধু হয় ____________________

____________________।

শঙ্খ ঘোষ (জন্ম ১৯৩২) : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। জন্ম চাঁদপুর, বাংলাদেশ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'। এছাড়াও লিখেছেন 'নিহিত পাতাল ছায়া', 'বাবরের প্রার্থনা', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন— 'ছোট্ট একটা ইস্কুল', 'অল্পবয়স কল্পবয়স', 'শব্দ নিয়ে খেলা', 'সকাল বেলার আলো', 'সুপুরি বনের সারি', 'শহর পথের ধুলো' ইত্যাদি। প্রবন্ধের বই হিসেবে 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক', 'ছন্দোময় জীবন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাঠ্য কবিতাটি তাঁর ' আমায় তুমি লক্ষ্মী বলো' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

১০.১ কবি শঙ্খ ঘোষের প্রথম কবিতার বই কোনটি?

১০.২ তাঁর লেখা দুটি ছোটোদের বইয়ের নাম লেখো।

১০.৩ 'একলা' কবিতাটি তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

১১. নিজের ভাষায় লেখো :

১১.১ কবি যখন একলা থাকেন, তখন তাঁর সঙ্গে কারা থাকে?

১১.২ কবিতায় বর্ণিত কাঠবেড়ালিকে ধরতে পারার চেষ্টায় কবি সফল হন কি?

১১.৩ কবি কোন বিষয়কে 'মস্ত আশীর্বাদ' বলেছেন?

১১.৪ কবির মনে কখন আর কোনো দুঃখই থাকে না?

১১.৫ চুপ-থাকাটাও কীভাবে কবির মনে বাজনা বাজায়?

১১.৬ মনে করো একদিন তুমি বাড়িতে একলা ছিলে। সারাদিন তুমি যা যা করেছ দিনলিপির আকারে লেখো।

১১.৭ পরিবারে কে কে তোমার সঙ্গে থাকেন?

১১.৮ স্বাধীনভাবে তোমাকে ছুটে যেতে দেওয়া হলে তুমি কোথায় যেতে চাইবে?

১১.৯ 'কাঠবেড়ালি' নিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের খুব সুন্দর একটা ছড়া আছে। শিক্ষকের থেকে শুনে নিয়ে খাতায় লিখে রাখো।

১১.১০ জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের শিখিয়েছেন যে, 'গাছেরও প্রাণ আছে।'—তুমি একথা কীভাবে বুঝতে পারো?

১১.১১ তোমার পরিবেশে তুমি কোন কোন কীটপতঙ্গ/ পশু/ পাখি নজর করেছ?

১১.১২ তোমার প্রতিদিনের চলার পথটি কেমন? সে পথের দু'পাশে তুমি রোজ কী কী দেখো তা বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করো। খাতায় দুজনের কথাবার্তার আদলে লেখো।

আকাশের দুই বন্ধু

শৈলেন ঘোষ

কে জানত, একদিন হঠাৎ ওদের দেখা হবে। ওদের বন্ধুত্ব হবে। ওদের আকাশে উড়িয়ে যুদ্ধ হবে প্যাঁচখেলার। একটা আর-একটার ঘাড়ে গোত মেরে যখন সুতোয় জড়িয়ে লাট খাবে, তখন চিৎকার করবে মানুষ আনন্দে! হ্যাঁ, ওরা দুটি ঘুড়ি। একটার নাম চাঁদিয়াল। আর-একটা পেটকাটা।

কে না দেখেছে, একটি বীজ মাটিতে পুঁতলে, তার থেকে কেমন করে গাছ জন্ম নেয়। গাছটি ধীরে ধীরে সবুজ পাতা ছড়িয়ে হাওয়ায় দোলে। ফুলের কুঁড়ি উঁকি মারে। ফুল ফোটে।

আবার দ্যাখো, ওই যে গাছে পাখির বাসা, মা-পাখি বাসায় বসে তার ডিমে কেমন তা দিচ্ছে! দিতে দিতে ফুট করে যেই ডিম ফুটছে, ছানাপোনা কিচিরমিচির ডাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। বেরিয়েই হাঁ করে মুখ তুলছে আকাশে। খাবার চাইছে মায়ের কাছে। তারা বড়ো হবে। একদিন আকাশে ডানা মেলে তারা

উড়বে। কী সুন্দর দেখতে সেই পাখি! বাহার-ছড়ানো কী তাদের গায়ের রং। আমরা চোখ মেলে দেখব, আর মনে মনে বলব, বাঃ!

এমনি করে রোজ পৃথিবী নতুন হচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে রোজ অসংখ্য প্রাণ। গড়ে উঠছে ভালোবাসা। আর বন্ধুত্ব। নতুন! নতুন!

কিন্তু ওই দুটো ঘুড়ি? ওরা তো আর গাছও নয়, পাখিও নয়। ওদের প্রাণও নেই, ভালোবাসাও নেই। হাতে গড়া দুটো খেলনা। কাগজের। কে তাদের বানিয়েছে, সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না! কে ছিল কোথায় তার কে হিসেব রাখে! ওদের কিনে আনা হয়েছে দোকান থেকে। উৎসবের দিনে উড়বে ওই দুটো ঘুড়ি। তারপরে লাট খেতে খেতে ওরা লড়াই করবে আকাশে। কে যে ভোঁকাট্টা হয়ে কোথায় পড়বে, কেউ জানে না। কেউ গড়িয়ে পড়তে পারে গাছে, কিংবা ইলেকট্রিক তারে। লুটিয়ে পড়তে পারে কারও ছাদে, নয়তো নদীর জলে। নদীর জলে নাকানিচোবানি খেয়ে তার বুকের কাঁপকাঠি ছিটকে গেলে, সে তখন কেবলই একটা ফাটা কাগজের টুকরো। তখন কেউ চোখ ফিরিয়ে দেখবে না তাকে। আহাও করবে না, উহুও করবে না। সে তখন একটা আবর্জনা। আবর্জনা নিয়ে কে আর দয়া দেখায়!

কিন্তু একদিন উৎসব আসেই। বাজনা বাজে। মাঠে, ছাদে, পথে-প্রান্তরে ঘুড়ির উৎসবে আকাশ উপচে পড়ে। উল্লাসে ভরে যায় চারদিক। আর সেই উৎসবে ওই দুটো ঘুড়ি পাক খায় আকাশে। একটা চাঁদিয়াল, অন্যটা পেটকাটা। এ-বাড়ির ছাদ, ও-বাড়ির একফালি ফাঁকা জমি থেকে ওদের ওড়ানো হচ্ছে। ওদের বুক ফুটো করে সুতো বাঁধা হয়েছে। সেই বাঁধা সুতো লাটাই ঘুরে খুলছে, ওদের হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। ভাসতে ভাসতে উড়ে যায়। উড়তে উড়তে চাঁদিয়াল যেন আড়চোখে তাকিয়ে দ্যাখে পেটকাটাকে। পেটকাটাও দ্যাখে যেন পিটপিটিয়ে চাঁদিয়ালকে। এবার বোধহয় প্যাঁচের খেলা শুরু হবে।

না তো! এখনও তো দুই ঘুড়ির দুই মালিকের সুতো ছাড়ার খেলা চলছে। আরও ওপরে উঠছে ওরা। উঠতে উঠতে দুই ঘুড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছে একে ওকে। দেখতে দেখতে দুলছে আর ভাবছে, তারা যেন কতদিনের বন্ধু। দুলতে দুলতে হঠাৎ যেন চাঁদিয়াল কথা বলল, এই আকাশ থেকে ওই নীচের নদীটা কী—সুন্দর দেখতে লাগছে! কেমন এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে!

পেটকাটা যেন তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, আমাদের এক-একজন বন্ধু-ঘুড়ির ল্যাজও এমনি করে হাওয়ায় ভাসে এঁকেবেঁকে।

চাঁদিয়ালটা বোধহয় একটু মুচকি হাসল। হাসতে হাসতে বলল, ঘুড়ির ল্যাজের সঙ্গে তুলনা করছিস নদীর? ঘুড়ির ল্যাজ তো এইটুকুস। আর নদী দ্যাখ কত বড়ো! জানিস নদীর চেয়েও বড়ো সাগর!

তুই কেমন করে জানলি? জিজ্ঞেস করল পেটকাটা।

চাঁদিয়াল উত্তর দিল, ওই যে দেখছিস ছেলেটি আমায় ওড়াচ্ছে, ও কাল আমায় কিনে আনে। ওর পাশে ওই যে দেখছিস আর-একটি ছোট্ট ছেলে লাটাই ধরে ওকে সাহায্য করছে, ওই ছেলেটি ওর ভাই। কাল সন্ধেবেলা ভাই যখন মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ছিল, তখন এইসব কথা শুনেছি। ওরা বলাবলি করছিল, পৃথিবীটা নাকি খুব সুন্দর। নাকি অনেক পাহাড় আছে, ঝরনা আছে। গাছ আছে, ফুল আছে। আবার কোথাও নাকি বরফ আছে, শুধুই বরফ। বরফ নাকি খুব ঠান্ডা!

পেটকাটা চাঁদিয়ালের কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তোর শোনাই সার, দেখা তো আর হচ্ছে না।

চাঁদিয়াল উত্তর দিল, ঠিক বলেছিস। একটু পরেই তোর সঙ্গে আমার প্যাঁচের লড়াই হবে। কেউ তো একজন ভোঁকাট্টা হয়ে হারিয়ে যাব। তখন কে যে কোথায় কোন বিপদে পড়ব কে জানে। আকাশটা যদি আমাদের ঘর-বাড়ি হত! আমরা যদি শুধুই আকাশে উড়তে পারতুম!

পেটকাটা বলল, আমরা বড়ো অসহায় না রে? মানুষের হাতের ওই সুতো যেমন করে আমাদের চালায়, আমরা তেমন করে চলি। আমরা তো ওদের হাতের গোলাম।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, জবাব দিল চাঁদিয়াল, ওদের হাতের ওই সুতো আমাদের ভাগ্য। ওই সুতো যদি প্যাঁচের সময় আমরা দুজনেই ছিঁড়ে ফেলতে পারি জট পাকিয়ে, তবে হয়তো রক্ষা পেতে পারি আমরা। উপড়ে যেতে পারি একসঙ্গে আকাশে। তখন আর আমাদের ধরার সাধ্য থাকবে না কারও। আমরা তখন আর অসহায় থাকব না। আমরা তখন দুই বন্ধু মুক্ত। আকাশ আমাদের সহায়। বলতে না-বলতেই হল্লা উঠল মানুষের গলায়। দুই ঘুড়ির প্যাঁচের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বলতে-না-বলতেই আচমকা পেটকাটার সুতোয় টান পড়ল। তিরবেগে সে ধেয়ে এল চাঁদিয়ালের দিকে। চাঁদিয়ালও ঝাঁপিয়ে পড়ল পেটকাটার সুতো জড়িয়ে। চেঁচিয়ে উঠল, ভয় পাস না পেটকাটা, আমি তোর সুতোয় আমার সুতো জড়িয়ে দিচ্ছি। আমাদের প্যাঁচে ফেলেছে ওরা। আয়, আমরা প্রাণপণে টান মারি দুজনে। হয় মরব। না হয় জিতব।

পেটকাটাও চেঁচিয়ে উঠল, ঠিক বলেছিস চাঁদিয়াল, বিপদ এলে এমনি করে একসঙ্গে লড়াই না করলে কেউ বোধহয় নিস্তার পায় না। আমি ভয় পাচ্ছি না। একটুও না। আমিও লড়াই করছি।

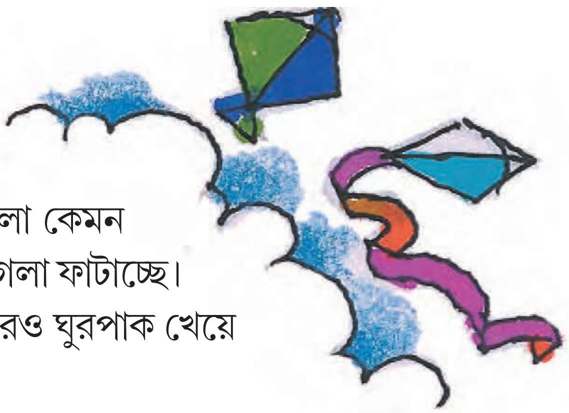

আকাশ থেকে নীচে তাকা। দ্যাখ, নীচের মানুষগুলো কেমন উল্লাস করছে! কে জিতবে কে হারবে। সেই নিয়ে ওরা গলা ফাটাচ্ছে। আমরা দুজনে কেউ কাউকে ছাড়ব না। আয় আমরা আরও ঘুরপাক খেয়ে আমাদের বাঁধন শক্ত করি। বলল চাঁদিয়াল।

তারপরেই সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। সুতো ছিঁড়ে সত্যি সত্যি উপড়ে গেল একসঙ্গে সেই দুটো ঘুড়ি, চাঁদিয়াল আর পেটকাটা। খুশিতে মাথা নাড়তে নাড়তে দুই বন্ধু যখন উড়ে যায়, তখন মাটির মানুষগুলোর উল্লাস থেমে গেছে। দুদলই তখন হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। আর হয়তো ভাবে, এ কেমন করে হয়! দুদলই হেরে গেল!

হ্যাঁ, হেরে গেল। আর দ্যাখো, ওই যারা জিতল, ওই দুই বন্ধু, পেটকাটা আর চাঁদিয়াল, কেমন আকাশে ভেসে যাচ্ছে, আনন্দে একসঙ্গে! ভাসতে ভাসতে কোথায় যে হারিয়ে যাবে ওরা, আমরাও জানি না। জানে শুধু আকাশ। কেন না, আকাশ যে ওদেরও বন্ধু!

১. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও:**

১.১ আকাশের দিকে তাকিয়ে তুমি কী কী দেখতে পাও?

১.২ আকাশে তুমি কী কী উড়তে দেখেছ?

১.৩ কোন কোন উৎসবে তুমি ঘুড়ি উড়তে দেখেছ?

১.৪ আকাশ কেমন থাকলে ঘুড়ি ওড়াতে সুবিধা হয়? ঘুড়ি ওড়াতে গেলেই বা কী কী লাগে?

১.৫ ঘুড়ি সাধারণত কোন কোন জিনিস দিয়ে তৈরি হয়? সুতোয় মাঞ্জা দিতে কী কী লাগে?

১.৬ 'আকাশের দুই বন্ধু' গল্পে দুটি জিনিস নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছে। অপ্রাণীবাচক দুটি জিনিস নিজেদের মধ্যে কথা বলেছে, এমন আর কোন গল্প তুমি জানো?

২. **নীচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে লেখো :**

ঠি প কাঁ কা	না র্জ আ ব
নি নি না চো কা বা	ক র ঘু পা

শব্দার্থ : বাহার— রূপ। গোলাম— ভৃত্য। সাধ্য— ক্ষমতা। নিস্তার— অব্যাহতি। হতভম্ব— বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে এমন।

৩. **'ক' আর 'খ'-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

ক	খ
মা-পাখি	বাজে
ছানাপোনা	ফোটে
চোখ	বয়ে যায়
বাজনা	ডিমে তা দেয়
ফুল	কিচিরমিচির করে
নদী	পিটপিটিয়ে দেখে

৪. **ঠিক উত্তরটা বেছে নিয়ে প্রতিটি বাক্য আবার লেখো :**

৪.১ এমনি করে পৃথিবী রোজ (নতুন / পুরোনো) হচ্ছে।

৪.২ বুকের (ঝাঁপকাঠি / কাঁপকাঠি) ছিটকে গেলে, সে তখন একটা কাগজের টুকরো।

৪.৩ একসঙ্গে লড়াই না করলে কেউ বোধহয় (বিস্তার / নিস্তার) পায় না।

৫. নীচের অনুচ্ছেদের বাক্যগুলিতে দেখো কোন কোন শব্দে মনে হচ্ছে কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর কোন কোন শব্দে মনে হচ্ছে কাজ শেষ হয়নি, সেগুলি আলাদা করে লেখো :

ওদের কিনে আনা হয়েছে দোকান থেকে। উৎসবের দিনে উড়বে ওই দুটো ঘুড়ি। তারপরে লাট খেতে খেতে ওরা লড়াই করবে আকাশে। কে যে ভোঁকাট্টা হয়ে কোথায় পড়বে, কেউ জানে না। কেউ গড়িয়ে পড়তে পারে গাছে, কিংবা ইলেকট্রিক তারে। লুটিয়ে পড়তে পারে কারও ছাদে, নয়তো নদীর জলে। নদীর জলে নাকানিচোবানি খেয়ে তার বুকের কাঁপকাঠি ছিটকে গেলে, সে তখন কেবলই একটা ফাটা কাগজের টুকরো। তখন কেউ চোখ ফিরিয়ে দেখবে না তাকে।

৬. চাঁদিয়াল আর পেটকাটা — গল্পে ঘুড়ি দুটোর নাম পেলে। আরো অনেকরকম নাম হয় ঘুড়িদের, ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেরা কথা বলে দ্যাখো আর কোনো ঘুড়ির নাম নিজেরাই জানো কিনা। নয়তো, বাড়িতে-স্কুলে বড়োদের কাছে জেনে নাও, তারপর লেখো।

৭. ঘুড়িদের প্যাঁচের লড়াইয়ে একটা অদ্ভুত ফল হয়েছে গল্পে। মানুষের হিসেবে দু দলই হেরেছে, ঘুড়িদের উদ্যোগে জিতেছে দু'জনেই। তুমি কি ঘুড়ির লড়াই দেখেছ কখনো? এমন অদ্ভুত ফল কিন্তু সচরাচর হয় না। সচরাচর এমন লড়াইয়ে যেটা হয়, সেটা চার-পাঁচ লাইনে লেখো।

৮. চাঁদিয়াল আর পেটকাটা— এই দুই ঘুড়ি আকাশ থেকে নীচের পৃথিবীকে দেখে অনেক গল্প করেছে নিজেরাই। মনে করো, তুমি উড়ে যেতে পেরেছ আকাশে,সঙ্গে তোমার বন্ধুও আছে। আকাশ থেকে নীচের পৃথিবীকে দেখে কী গল্প করবে তোমরা, সেটা লেখো।

৯. **অর্থ লেখো :** কুঁড়ি, বাহার, গোলাম, মুক্ত।

১০. **সমার্থক শব্দ লেখো :** নদী, আকাশ, গাছ, বন্ধু, সাগর।

১১. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** চিৎকার , আনন্দ, ঠিক, অসহায়, সাধ্য।

১২. **বাক্য রচনা করো :** বন্ধুত্ব, চোখ, দয়া, ভোঁকাট্টা, উল্লাস।

১৩. **কোনটি কোন প্রকারের বাক্য লেখো (একটি করে দেওয়া হলো) :**

১৩.১ মনে মনে বলব, বা: ! (বিস্ময়বোধক)

১৩.২ তুই কেমন করে জানলি ?

১৩.৩ বরফ নাকি খুব ঠান্ডা !

১৩.৪ জানে শুধু আকাশ।

১৩.৫ খাবার চাইছে মায়ের কাছে।

১৪. কোনটি কোন ধরনের শব্দ আলাদা করে লেখো :

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া

দেখা, বড়, প্রাণ, নতুন,কে, ওদের, ঠান্ডা, শক্ত, ভয়, সবুজ, ভাবছে, মুক্ত, কেউ, সুতো, যে, লড়াই, আর, ওই, ডাক, ওর, আমরা, রক্ষা, টান, রাখে।

১৫. ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও :

১৫.১ কে জানত, একদিন হঠাৎ ওদের দেখা হবে।

১৫.২ আবর্জনা নিয়ে কে আর দয়া দেখায় !

১৫.৩ এমনি করে রোজ পৃথিবী নতুন হচ্ছে।

১৫.৪ উল্লাসে ভরে যায় চারিদিক।

১৫.৫ জানে শুধু আকাশ।

শৈলেন ঘোষ (জন্ম ১৯২৮) : কৈশোরে ছোটোদের পত্রিকা 'মাস পয়লা'য় প্রথম কবিতা লেখা। 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' শিশু নাটকটি সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। তাঁর রচিত উপন্যাস- 'মিতুল নামে পুতুলটি' জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'আমার নাম টায়রা', 'গল্পের মিনারে পাখি', 'ভূতের নাম আক্কুশ', 'টুই টুই' ইত্যাদি। এছাড়ও ছোটোদের জন্য অজস্র গল্প, ছড়া, নাটক রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন- 'হাসি ঝলমল মজা', 'স্বপ্ন দেখি রূপকথায়', 'ভালোবাসি পশুপাখি', 'গল্পের রং রকম রকম'।

পাঠ্য 'আকাশের দুই বন্ধু' গল্পটি তাঁর 'স্বপ্ন দেখি রূপকথায়' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৬.১ 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' বইটি কার লেখা ?

১৬.২ তাঁর অন্যান্য দুটি বইয়ের নাম লেখো ?

১৬.৩ তোমার পাঠ্য 'আকাশের দুই বন্ধু' গল্পটি কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে ?

১৭. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৭.১ গল্পে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়, সুন্দর রূপ কীভাবে ফুটে উঠেছে ?

১৭.২ পেটকাটা ও চাঁদিয়ালের কীভাবে দেখা হয়েছিল ? তাদের বন্ধুত্বই বা কীভাবে গড়ে উঠল ?

১৭.৩ বন্ধুত্বকে অটুট রাখতে তারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ?

১৭.৪ তাদের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কীভাবে সফল হল ?

১৭.৫ গল্পে আকাশ কীভাবে দুটি বন্ধু-ঘুড়ির বন্ধু হয়ে উঠল ?

১৮. একটা ছবি আঁকো — আকাশে দুটো ঘুড়ি উড়ছে পাশাপাশি, ঘুড়ি দুটোতে ইচ্ছেমতো রং দাও।

পাখি নয়, ঘুড়ি !

আকাশে উড়তে পারে এমনই এক কাগজের খেলনা হল ঘুড়ি। উড়ন্ত ঘুড়িকে লক্ষ করে দেখবে ঘুড়িয়ালের কারসাজিতে কখনো সে শোঁ শোঁ করে উড়ছে, আবার কখনো লাট খেয়ে নেমে আসছে নীচে। নীল আকাশে উড়ে যাওয়া ঘুড়ির সঙ্গে আমাদের মনও ওঠে, নামে, দূরে ভেসে যায়। মানুষের তো ডানা নেই কিন্তু তারই বানানো কাগজের এই পাখি তার ওড়ার স্বপ্নকে সত্যি করে তোলে। উপরে রইল চিনের পাখি-ঘুড়ির ছবি।

ঘুড়ির ইতিহাস অনেক পুরোনো। পৃথিবীর সব দেশেই ঘুড়ি বানানো, ওড়ানো এবং ঘুড়ি নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার চল রয়েছে। আমাদের দেশেরই বিভিন্ন রাজ্যে ঘুড়ির নানারকম নাম, যেমন—রাজস্থানে পতং, তামিলনাড়ুতে পত্তম, হিন্দি ভাষায় ঘুড্ডি। ইংরাজিতে ঘুড়িকে বলা হয় 'কাইট'।

নানা দেশের নানা রকমের কয়েকটা ঘুড়ির ছবি সঙ্গে দেওয়া রইল।

চাঁদিয়াল

ইন্দোনেশিয়ার পাতাঘুড়ি

পেটকাটি

বোম্বাগড়ের রাজা

সুকুমার রায়

কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা—
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
রানির মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানির দাদা?
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগবাজি খায় লোকে?
জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?
ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?

টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে!
রাত্রে কেন ট্যাঁকঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে?
কেন রাজার বিছ্না পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে?
সভায় কেন চেঁচায় রাজা 'হুক্কা হুয়া' বলে?
মন্ত্রী কেন কলসি বাজায় বসে রাজার কোলে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি?
রাজার খুড়ো নাচেন কেন হুঁকোর মালা পরে?
এমন কেন ঘটছে তা কেউ বলতে পারো মোরে?

হাতে কলমে

শব্দার্থ : ফ্রেম— ছবি বাঁধাইয়ের কাঠামো। সদাই— সবসময়ই। অষ্টপ্রহর—সারা দিন রাত। ওস্তাদ— দক্ষ ব্যক্তি। ট্যাঁক ঘড়ি— কোমরের কাপড়ে গোঁজা ঘড়ি। খুড়ো— কাকা।

১. ‘বোম্বাগড়ের রাজা’ কবিতাটি পড়ে সেখানকার মানুষ ও নিয়মকানুন তোমার কেমন লাগল, তা নিজের ভাষায় লেখো।

———————————————————————————————

২. বোম্বাগড়ে যাওয়ার পরে, রাজার সঙ্গে যদি তোমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়, আর তোমাকেই নিয়মকানুন একটু-আধটু বদলে নিতে বলেন তিনি, কিংবা, বলেন জুড়ে দিতে নতুন কোনো নিয়ম, অথবা, একটি দিনের জন্য তোমাকেই করে দেন বোম্বাগড়ের রাজা, তবে তুমি কী কী করবে?

———————————————————————————————

৩. ‘বোম্বাগড়ের রাজা’ কবিতাটির সঙ্গে সুকুমার রায়ের লেখা ‘একুশে আইন’ কবিতাটির খুব ভাবগত মিল রয়েছে। শিক্ষকের থেকে কবিতাটি শোনো। ভালো লাগলে খাতায় লিখে নাও। এমন আরো কবিতা সংগ্রহ করো, যেখানে অদ্ভুত সব নিয়মের কথা রয়েছে।

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩): ‘আবোল তাবোল’, ‘হযবরল’ , ‘পাগলা দাশু’ ইত্যাদি এর স্রষ্টা সুকুমার রায়। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। প্রত্যেক বাঙালির শৈশবে জড়িয়ে আছেন এই কবি ও সাহিত্যিক। চিত্রশিল্প, ফটোগ্রাফি, সরস ও কৌতুককর কাহিনি এবং ছড়া রচনায় সুকুমার রায় অতুলনীয়। তাঁর রচিত অন্যান্য রচনা — ‘খাই খাই’, ‘ অবাক জলপান’, ‘ঝালাপালা’, ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’,‘ হিংসুটি’ ইত্যাদি। স্বল্পদিনের জীবনে তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন তা থেকে বাঙালি জাতি চিরদিন অনাবিল আনন্দের স্বাদ পাবে।

পাঠ্য ‘বোম্বাগড়ের রাজা’ কবিতাটি ‘আবোল তাবোল’ কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪.১ সুকুমার রায়ের বাবার নাম কী?

৪.২ ‘আবোল তাবোল’ কবিতার বইটি কার লেখা?

৪.৩ তাঁর লেখা অন্য দুটি বইয়ের নাম লেখো।

বই পড়ার কায়দা-কানুন

বই হলো অজানাকে জানার সবথেকে বড়ো জানলা
বই মানে কত খবর
বই পড়বই, পড়ে শিখবই, আরো জানবই

যদি থাকত ভূতের রাজার জাদু-জুতো, তালি মেরে গুপি-বাঘার মতো নিমেষে চলে যাওয়া যেত যেকোনো জায়গায়। কোথাও মরুভূমি তো কোথাও বরফ-ঢাকা চারিদিক। সে তো হবার নয়। তাহলে উপায়?

শুধু এই বিশাল দুনিয়ার দেশ-বিদেশই বা কেন, জানতে ইচ্ছা করে তো কত কিছুই। পুরোনো দিনের রাজরাজড়ার কাহিনি, অভিযানের রোমাঞ্চ, মহাকাশে কী আছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প, সমুদ্রের গভীরে কী খেয়ে বাঁচে তিমি বা অক্টোপাস, কোন ভাষায় কথা বলে তাহিতি দ্বীপের মানুষ...আরো কত কী। তাহলে উপায়?

উপায় হলো বই। বই মানে বই পড়া। সভ্যতার কোন আদিযুগে মানুষ ভেবেছিল এমন একটা জ্ঞান ভান্ডারের কথা। বলা চলে, মানুষের সেরা আবিষ্কার। যুগ-যুগান্ত কেটে যায়, বইয়ের মধ্যে ধরা থাকে সেসব যুগের মানুষের ভাবনা। তারা অমর। বই পড়ো। এমন সুযোগ হেলায় হারিও না। যতো পারো বই পড়ো। জেনে নাও অজানাকে। অজানাকে জানার সব থেকে বড়ো জানলা বই।

‘বই পড়ে কত কিছু
শেখা যায় তাই,
একটা কি দুটো নয়
আরো বই চাই।
ছোটো থেকে বড়ো হতে
বই চাই পড়া
তবেই তো হবে ঠিক
মনটাকে গড়া।’

রকমারি বই

ভালো করে তাকাও বইয়ের দিকে।

মানুষের মতোই তারা, কত আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ খাটো। বই আবার নানা আকারেরও হয়। কোনোটা চৌকো, কোনোটা আয়তাকার, কেউ বা লম্বাটে।

বইয়ের যেমন আকার-আকৃতি আলাদা, তার ভাষাও হতে পারে আলাদা, বিষয় কিংবা রচনারূপও হতে পারে ভিন্ন। কীরকম? ধরো, জাপানি বা মারাঠি বা আরবি ভাষার বই। আবার কোনোটা কবিতা, কোনোটা উপন্যাস, কোনোটা নাটক। সে-সব তো পরের কথা। প্রথম হলো বইটার নাম। নাম জানা যাবে বই খুললেই। যে পাতায় ছাপা থাকে নাম সেটাকে বলে নামপত্র বা আখ্যাপত্র। ইংরাজিতে বলে Title Page। বইয়ের নামের নীচেই থাকে লেখকের নাম।

যদি হয় প্রবন্ধ বই তাহলে আরো প্রশ্ন উঠবে। কী নিয়ে লেখা? ইতিহাস, মানে পুরোনো দিনের ঘটনার সাতকাহন? বিজ্ঞানের বই? ভূগোল নিয়ে লেখা? নাকি, রাজনীতি বা সমাজ নিয়ে বিচার? সোজা কথায় বলা চলে বিষয়। বইটা কোন বিষয়ের সেটা বলাও জরুরি। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস হলে যেমন বলা চলে বইয়ের বিষয় 'সাহিত্য'। বইকে নানান নামে আমরা ডাকি। বই, পুস্তক, গ্রন্থ, কেতাব আরো কত কী! আগে ছিল পুঁথি। কিন্তু, যে নামেই ডাকো তার পরিচয় খোলসা করতে হয়। বিজ্ঞানের বই, ইতিহাসের বই, অথবা ধরা যাক গণিতের বই।

আরো আছে। একটু লক্ষ করলেই দেখবে বইয়ের হরফ আলাদা-আলাদা হতে পারে। তার বিন্যাস, তার আকার, তার চেহারা বিভিন্ন। কাগজও নানারকম। কোনোটা চকচকে, কোনোটা মোটা, কোনোটা মসৃণ, কোনোটা একটু হলদেটে। তারপর মলাট, তারপর বাঁধাই, তারপর ওজন।

বই নিয়ে কথা বললে শেষ হবার নয়। বিচিত্র একটা জগৎ এই বইয়ের জগৎ। বই আছে তাই রক্ষে! নইলে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির তফাৎ কী হতো? কখনো দেখেছ বা শুনেছ, অবসর সময়ে সিংহ বা ছাগল বই পড়ছে?

বই-এর যত্ন

যা যা করা উচিত নয়

- বই যেখানে রাখবে সেই জায়গাটা ভালো করে দেখে নেবে সেখানে জল, তেল বা চটচটে কোনো জিনিস থাকলে তার ওপরে বই রাখবে না। নইলে, বই নষ্ট হবে।
- ময়লা হাতে বই ধরবে না। খেতে খেতে বই পড়বে না। নইলে, পাতায় দাগ পড়বে আর পরে পাতা নষ্ট হয়ে যাবে।
- বই-এর কোণ বা পাতা মুড়বে না বা ভাঁজ করবে না। এর জন্য বই-এর পাতা কেটে যায়।
- বই-এর পাতায় অযথা দাগ কাটবে না। যদি খুব দরকারে কিছু লিখতেই হয়, তাহলে পেনসিলে লিখবে।
- বই খোলা অবস্থায় উলটে রাখবে না বা বই-এর মধ্যে পেনসিল, পেন বা রবার জাতীয় কোনো জিনিস রেখে বই মুড়ে রাখবে না। এতে বই-এর বাঁধাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- অন্ধকারে বা খুব কম আলোয় কষ্ট করে বই পড়বে না। এতে চোখের ক্ষতি হয়।
- বই রোদে দিয়ে শুকোবে না। বই-এর পাতায় সরাসরি রোদ পড়লে পাতা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যায়।
- বই পুরো উলটো দিকে মুড়বে না, বা গোল করে পাকাবে না।
- বই-এর মধ্যে পুরোনো কাগজের টুকরো ইত্যাদি পাতার ভাঁজে ভাঁজে রাখবে না।

যা যা করা উচিত

- বই রাখার জায়গা যেন শুকনো আর পরিষ্কার থাকে।
- বই পড়ার সময় যথেষ্ট আলো আছে এমন জায়গা বেছে নেবে।
- বই পড়তে পড়তে উঠে গেলে বইটা বন্ধ করে যে পাতা পড়ছিলে, সেই পাতার মধ্যে এক টুকরো কাগজ দিয়ে পাতার চিহ্ন রেখে বই বন্ধ করে উঠবে।
- বই ভালো রাখতে বই-এর ওপরে মলাট দিতে পারো। পুরোনো ক্যালেন্ডার বা ব্রাউন পেপার দিয়ে মলাট দিলে বই ভালো থাকবে। খবরের কাগজের মলাট না দেওয়াই ভালো।
- বই ছিঁড়ে গেলে আবার বাঁধিয়ে নিতে পারো।
- বই-এর মধ্যে নিমপাতা রেখে দিলে পোকা ধরে না।

বই পড়ার ডায়েরি

সংখ্যা	বই পড়ার তারিখ (শুরু থেকে শেষ)	বইয়ের নাম	লেখক	বইটার বিষয় বা ধরন	কোথা থেকে পেয়েছ বা কে পড়তে বলেছেন

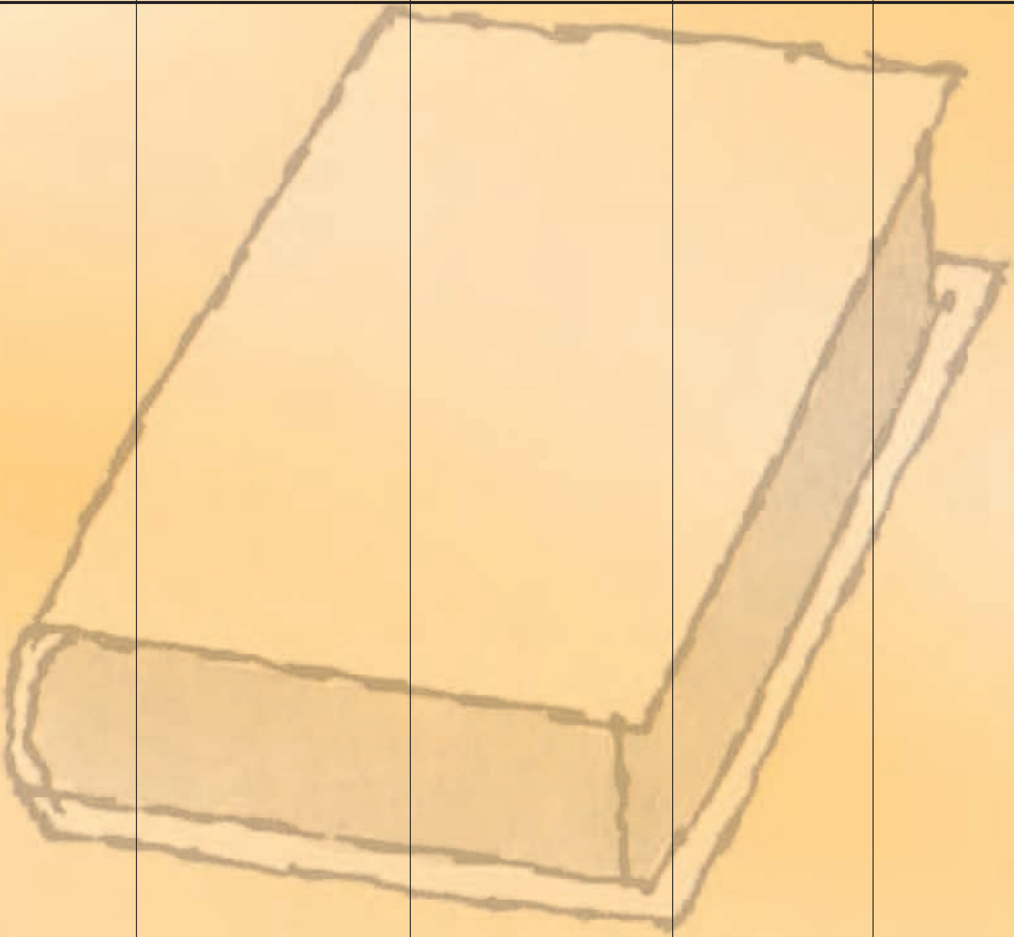

বই পড়ার ডায়েরি

সংখ্যা	বই পড়ার তারিখ (শুরু থেকে শেষ)	বইয়ের নাম	লেখক	বইটার বিষয় বা ধরন	কোথা থেকে পেয়েছ বা কে পড়তে বলেছেন

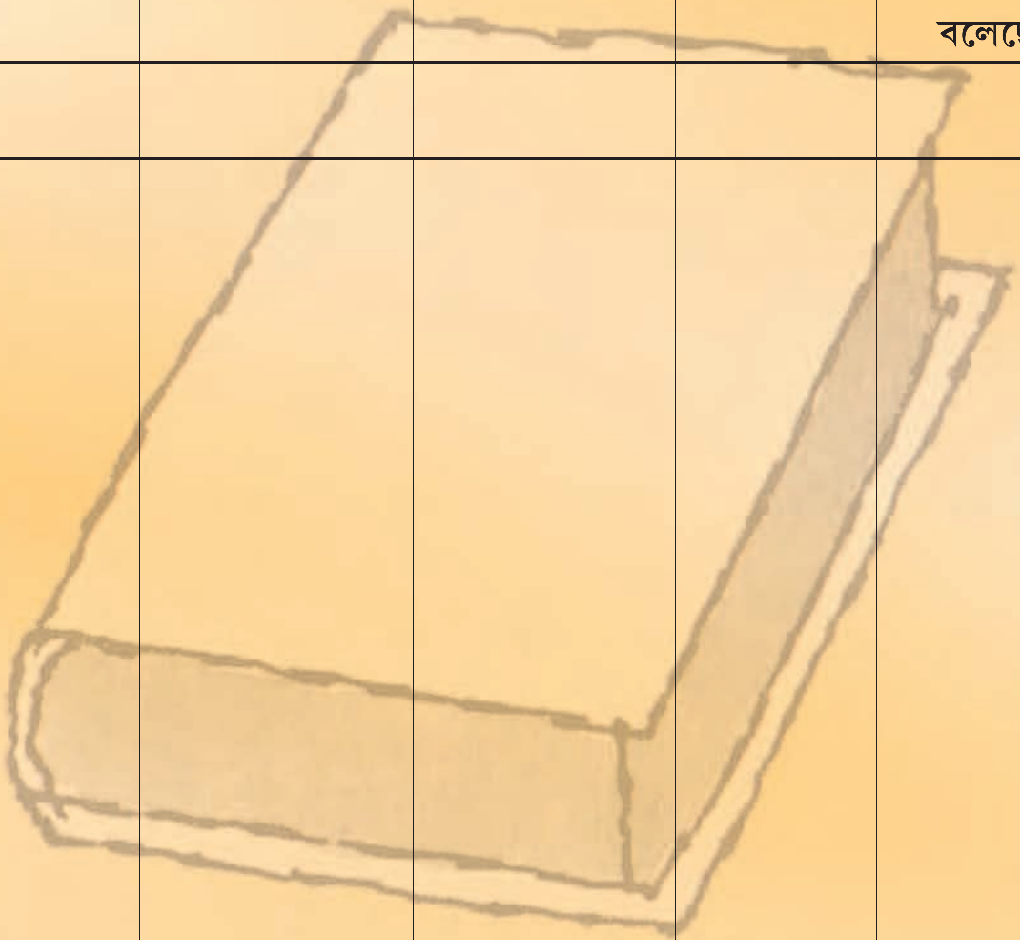

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

শিখন পরামর্শ

- বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তকটি (পঞ্চম শ্রেণি-বাংলা) রূপায়িত হলো। পড়ানোর আগে পুরো বইটি যত্ন নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক পড়ে নেবেন।
- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) 'রূপময় প্রকৃতি এবং কল্পনা'। নানা ছড়ায়, কবিতায়, গানে, গল্পে নাটকে তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্য, লাবণ্য এবং ঋতু-বদলের বৈচিত্র্য, আর তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মানবমনের বহুমাত্রিক কল্পনা। ছোটোরা এই বইয়ে পড়বে রূপকথা, বন্ধুত্ব আর সহানুভূতির গল্প, আদিবাসীদের জীবনকথা, প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয়ক গান, মনীষী ও বিপ্লবী চরিতকথা, উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের কথা আবার একেবারে দক্ষিণ বঙ্গের প্রান্তিক মানুষদের কঠোর জীবন-সংগ্রামের বিবরণ। এছাড়াও তরুণের স্বপ্ন, মজার ছড়া, শিক্ষামূলক কবিতা, শিশু-ভোলানো আখ্যান এবং খেয়ালি কল্পনার মুক্ত, সমৃদ্ধ ও প্রশস্ত জগৎ তো রইলই। মনে রাখতে হবে ভাবমূল (Theme) মানে কিন্তু বিষয়ের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয়, তা একটি বিশেষ অভিমুখে গতিময় ঝোঁক। শিশু মনের স্বাধীনতাকে সেই প্রকল্প ব্যাহত করে না, বরং উন্মুক্ত করে নতুন কল্পনা আর শিখনের জগৎ। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে তাকে ভোলায়, ভাবায়, আলোড়িত করে। এভাবেই গড়ে ওঠে শিশুর নিজস্ব অভিব্যক্তি। তাই বইটিকে কাজে লাগিয়ে বদলাতে হবে শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি। কিন্তু কীভাবে? সহজভাবে বলতে গেলে দলগত এবং একক এই দুই উপায়েই। শিশুকে হাতে-কলমে কাজে যুক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর করে তুলে শিক্ষিকা/শিক্ষক তাকে সাহিত্য পঠনের পথ দেখাবেন। অন্যদিকে এই কাজ হবে ছাত্রছাত্রীর জীবন-অভিজ্ঞতা নির্ভর আর বৈচিত্র্যময়। আনন্দদায়ক স্ব-শিখনের পথে তাদের এগিয়ে দেবে। বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের বহু ধরনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে রাখতে হবে যাতে সে পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত দক্ষতাও অর্জন করতে পারে। এই বিষয়টির একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক—
- ধরা যাক, একটি পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর কথা। ধরে নেওয়া যেতে পারে এই স্তরে সে ইতোমধ্যেই বলা, পড়া ও লেখার ক্ষমতা অর্জন করেছে। এবার আমরা ভাষা ও সাহিত্যের কোনো পাঠ, ধরা যাক কোনো কবিতা পড়ার বা পড়ানোর সময় তাকে কীভাবে সাহায্য করব? যে কোনো সাহিত্যের পাঠকে আয়ত্ত করার প্রধান উপায়টি হলো—

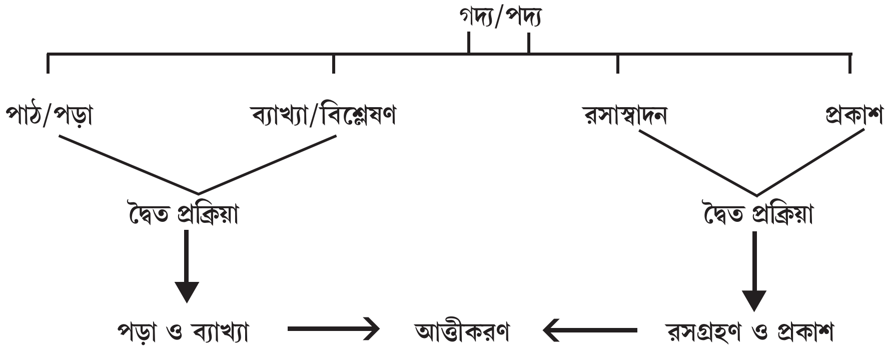

উপরের বিষয়টি শিক্ষকমাত্রেই বোঝেন এবং এই সারণিবদ্ধ তত্ত্বকথা যে কখনোই এই স্তরের শিশুদের বোঝানোর জন্য নয়-একথাও তিনি মানবেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা এর সঙ্গে শিশুদের ধাপে ধাপে জড়িয়ে নেব। ধাপগুলি কেমন—

- প্রথমেই শুরু করতে হবে দলগত ও একক পাঠ। পড়ানোর সময় বইয়ের ছবির সুবিধে মতো সাহায্য নিতে পারেন। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই ছবি এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় মাধ্যম এবং তা শিশুমনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। তখন অলঙ্করণগুলিও পাঠ্য গল্প বা কবিতা বুঝতে চাবিকাঠির কাজ করে। আবার অনেক সময় তাকে আঁকার মতো সৃষ্টিশীল কাজেও অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং ছবির সাহায্যে তাকে পাঠ্য বিষয়ে আকৃষ্ট করে, পড়া বা পাঠ্য বিষয়টিকে আপনি আনন্দদায়ক করে তুলতে চাইবেন। এই স্তরের ছাত্র বা ছাত্রী প্রচলিত অনেক শব্দের অর্থই জানে, যেগুলি অপ্রচলিত বা অজানা তার জন্য 'হাতে-কলমে' বিভাগের শব্দার্থ অংশ আছে এবং সর্বোপরি আপনি আছেন। পাঠ এবং ছোটো বাক্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আপনি এগোতে পারেন।
- শ্রেণিকক্ষে চেষ্টা করবেন বলা ও লেখা এই উভয় ক্ষেত্রেই মান্য চলিতের অনুশীলন করতে। একতরফা বক্তৃতামূলক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবেন। কিন্তু ধরা যাক পাঠ্যে এমন কোনো অংশ আছে যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শক্ত বা দীর্ঘ, কী করা হবে?

- ‘হাতে-কলমে’ বিভাগের ‘মিলিয়ে পড়ো’ অংশে কিছু আছে কিনা দেখে নিন। কেননা ওখানে দেওয়া আর একটি ছড়া বা কবিতা তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেওয়া নয়, বরং তা লেখকের বিষয়গত দৃষ্টিকোণটিকে আর একটু প্রসারিত করে, নতুন কোনো মজার ভাবনা মেলে ধরে, যা হয়তো শিক্ষার্থীর মনের একটু কাছাকছি। এই অংশটিকে আপনি মূল পাঠ্যের মাঝে বা শেষে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারেন।
- এভাবে, ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ কবিতাটি একটু বড়ো, আপনি ‘মিলিয়ে পড়ো’ অংশের ‘বাদল-বাউল’ গানটি গেয়ে বা পড়ে শ্রেণিকক্ষের আবহ বদলে দিতে পারেন। শিশু আনন্দ পাবে, তার একঘেয়েমি কেটে যাবে, নতুন করে পাঠ্যে তার মনোযোগ ফিরে আসবে। তখন আবার পাঠ্যে ফিরে আসুন।
- ‘মিলিয়ে পড়ো’ অংশ যদি না থাকে, সবক্ষেত্রে নেইও, সেক্ষেত্রে ‘হাতে-কলমে’ বিভাগটি দেখবেন যেখানে দিনলিপি লেখা, সংলাপ, ছবি দেখে লেখা, চিঠি লেখা, মানস মানচিত্র তৈরি করা কিছু একটা থাকবে, তাকে কাজে লাগাবেন শিশুকে জড়িয়ে নিতে। তাকে একটু শিখিয়ে নিয়ে মনে মনে ভেবে লিখতে উৎসাহ দেবেন।
- যদি এর কোনোটাই ‘হাতে-কলমে’ অংশে না থাকে, হয়তো আপনি গান করতে চাইছেন না, ব্ল্যাকবোর্ডে একটি দিনলিপির ছক করে দিন, তাদের সম্পূর্ণ করতে বলুন। কঠিন মনে হলে এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করতে দিন।
- আশা করি আমরা কীভাবে ধাপে ধাপে এগোতে চাইছি তা স্পষ্ট করা গেছে। পাঠের সঙ্গে শিশুর নিরবচ্ছিন্ন যোগ তৈরি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই পাঠ চলাকালীন যেকোনো সময় ‘হাতে-কলমে’র যে কোনো অংশ আমরা কাজে লাগাবো বিশ্লেষণে, নির্মাণে পুরোটাই শিশুকে সক্রিয়তায় জড়িয়ে রেখে। এই ভাবে ‘পাঠ’ আর ‘হাতে-কলমে’ অংশ একসঙ্গে শেষ করা যাবে।
- এই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক ভাবে বজায় রাখলে শিশুর মনে সাহিত্যের রসাস্বাদন করার ক্ষমতা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি তাকে বুঝে প্রকাশ করার ক্ষমতাও গড়ে উঠবে। শিশুরা তাদের আঁকা ছবি ও খাতায় লেখা দিনলিপি ও চিঠি সাজিয়ে নিজেরাই তৈরি করতে পারবে নিজেদের দেওয়াল পত্রিকা। আপনি শুধু ওদের সঙ্গে থাকুন।
- এছাড়া আপনি ‘হাতে-কলমে’র লেখক- পরিচিতি অংশ নিয়ে কাজ করার সময় সেই লেখকের অন্য কোনো লেখা তাদের পড়ে শোনাতে গ্রন্থাগারে যেতে ও আরও পড়তে তাদের উৎসাহিত করবেন। গ্রন্থাগার না থাকলে নিজেই বই এনে তাদের পড়ে শোনান। পাঠ্য বইয়ের ‘বই পড়ার কায়দা-কানুন’ রচনাটির সঙ্গে প্রদত্ত তালিকাটি অবশ্যই পূরণ করতে বলুন।
- এবার আসি ব্যাকরণের কথায়। ‘ভাষা-পরিচয়’ বাদ কেন এটি একটি সংগত প্রশ্ন হতে পারে। বিষয়টি এই যে, সব সময়ই নতুনের কিছু কিছু সমস্যা থাকে। নতুন পাঠক্রমে ব্যাকরণের বিষয়টি তার সুস্পষ্ট রূপরেখা নিয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে আরম্ভ হচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ.... এই ভাবে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তার যাত্রা। এই বছর তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণিতে নতুন বই চালু হলেও চতুর্থ শ্রেণিতে তা হচ্ছে না। সুতরাং পারস্পরিক সম্পর্কে গ্রথিত এই বিন্যাসে চতুর্থ শ্রেণির অংশটিকে বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে পঞ্চম শ্রেণির ব্যাকরণ রাখা যেতে পারেনা। সেক্ষেত্রে তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে। কেননা এ বছরের পঞ্চম শ্রেণির শিশুরা পুরোনো পাঠক্রমের ব্যাকরণই চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে আসছে।
- এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নতুন বইয়ের ‘হাতে-কলমে’ অংশে ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চায় নতুন ও পুরোনোর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান বইটিতে ব্যাকরণ চর্চার মধ্যে রয়েছে বানান-বিধি সম্পর্কে পরিচিতি, সমার্থক শব্দের সঙ্গে পরিচিতি, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া প্রভৃতি শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিতি, বাক্যে তাদের ব্যবহার শেখা, বাক্য রচনা করা, বিপরীত শব্দ তৈরি, বাক্যের শ্রেণি বিভাগ, ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে ধারণা, বাক্য জুড়ে লেখা বা বাক্যকে ভেঙে আলাদা করে লেখা শেখা, একটি ও তার বেশি শব্দের বাক্য তৈরি, বর্ণ সাজিয়ে শব্দ বা শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি, একই অর্থের অন্য শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নেওয়া, এক কথায় প্রকাশ করা, সমোচ্চারিত ও ভিন্নার্থক শব্দ খুঁজে বার করা, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দ-দ্বৈতর ধারণার প্রয়োগ প্রভৃতি জরুরি প্রসঙ্গ। এছাড়া জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশ্নের সম্ভার সমগ্র বইটিতে ছড়িয়ে রয়েছে।
- শিশুমনের বিকাশে শিক্ষিকা/শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। যেহেতু বইটির ভাবমূল (Theme) ‘রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা’, তাই পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে ঋতু পর্যায়ের একটি সুস্পষ্ট যোগ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন বইয়ের শুরুতেই ‘গল্প-বুড়ো’ আর ‘বুনো হাঁস’ রাখা হয়েছে শীতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, এইভাবে বসন্তে রবি ঠাকুরের গান ‘ওরে গৃহবাসী’, গ্রীষ্মে ‘ঝড়’ আবার বর্ষায় ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ আগস্টে ‘মাস্টারদা’— এইভাবে সময়ের সঙ্গে বিষয়ের পারম্পর্য রেখে পঠন-পাঠন চলবে। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর জীবন-অভিজ্ঞতা, চারপাশের প্রকৃতি আর বিস্তৃত বিশ্বভুবন-কে সংযুক্ত করার চেষ্টা শিক্ষিকা/শিক্ষকদেরই করতে হবে।
- পাঠ্যবইয়ের রসহীন, আনন্দহীন এবং আতঙ্কময় তথ্য-তত্ত্বের মুখস্থবিদ্যা চর্চা কোনোক্রমেই বিদ্যাশিক্ষা নয়। পাঠ্য পুস্তক পরিকল্পনায় এবং তার অনুশীলনীতে সেই প্রথাবদ্ধ ধরনকে বর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকে নিয়মিত হাতের লেখা দিতে হবে। হাতের লেখা অভ্যাসের পাশাপাশি শেষ তিন লাইনে হাতের লেখার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী ছবি আঁকবে।
- হাতে-কলমে অংশটিকে বিশেষ গুরুত্ব এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষার্থী একতরফা শুনে যাওয়ার পরিবর্তে সক্রিয়তার মাধ্যমে অনেক দ্রুত এবং কার্যকরভাবে শেখে।

- শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রতিটি পাঠ্যাংশ পড়ানোর ক্ষেত্রে বা হাতেকলমে চর্চার প্রসঙ্গে যে কোনো ধরনের উজ্জীবনী তথা উদ্ভাবনী অংশ সংযোজন করতে পারেন।
- পাঠ্যসূচিতে থাকা গানগুলি শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গেয়ে শোনাবেন, এছাড়া কোনো বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যও নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সমবেত সংগীতে অংশ নিতে উৎসাহিত করবেন। এই গানগুলি বসন্ত উৎসব, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে হয়, সেখানে ব্যবহার করবেন। গানকে গান হিসেবেই ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে রাখবেন। কবিতা হিসেবে নয়। পারলে এইধরনের আরও গান শোনান ও শেখান।
- বইটি পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকের প্রধান নজর থাকবে শিক্ষার্থীর শিখনস্তরের দিকে। প্রয়োজনে তিনি পূর্বপাঠের পুনরালোচনা বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ পাঠ-পরিকল্পনার কথাও ভাবতে পারেন।
- সমগ্র পুস্তকটিই পাঠ্য। অংশবিশেষ পাঠ্য নয়। পাঠদানের ধারাবাহিক গতি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্থির করতে হবে, কিন্তু তা কখনোই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের কথা ভুলে গিয়ে নয়।
- শিশুশিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার সম্ভাব্য সময়সূচি ও পাঠ্যক্রম :

মাসের নাম	পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি	গল্পবুড়ো, বুনো হাঁস, বই পড়ার কায়দা কানুন*	রূপকথার গল্প। পরিযায়ী পাখিদের কথা।
ফেব্রুয়ারি	দারোগাবাবু এবং হাবু, এতোয়া মুন্ডার কাহিনি	
মার্চ	পাখির কাছে ফুলের কাছে, ওরে গৃহবাসী, বিমলার অভিমান	বসন্তের গানের চর্চা। লিঙ্গ-সাম্যের ধারণা।
এপ্রিল	ছেলেবেলা, মাঠ মানে ছুট, লিমেরিক	
মে	ঝড়, মধু আনতে বাঘের মুখে	গরমের ছুটির কারণে কর্মদিবস কম।
জুন	মায়াতরু, ফণীমনসা ও বনের পরি, পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে	ময়দানব পড়াবেন।
জুলাই	বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, বোকা কুমিরের কথা	বর্ষার গানের চর্চা।
আগস্ট	চল্ চল্ চল্, মাস্টারদা, মুক্তির মন্দির সোপানতলে	দেশের কথা ও দেশাত্মবোধক গানের চর্চা।
সেপ্টেম্বর	মিষ্টি, তালনবমী	নাটকটি শ্রেণিকক্ষে মঞ্চস্থ করুন।
অক্টোবর নভেম্বর	একলা, শরৎ তোমার, আকাশের দুই বন্ধু, বোম্বাগড়ের রাজা	পুজোর ছুটির জন্য দুমাস একসঙ্গে দেখানো হলো।

* দুমাস অন্তর বইপড়া নিয়ে কথা বলুন। প্রত্যেকের 'বইপড়ার ডায়েরি' অংশটি দেখুন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন।